দিয়াছেন। মণিকাকে কালই লিলি আসিয়া লইয়া যাইবে। তবে যদি আপনাদের আপত্তি হয় তো আজই"— মিসেস্ চৌধুরী মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "না না, মিঃ রায়, আজ আর কেন যাইবেন, আমি ত জানিতাম না আপনার সহিত বিবাহ ঠিক হইয়াছে, আপনি ত এপর্য্যন্ত বিবাহের কোন লক্ষণ দেখান নাই, কি করিয়া জানিব বলুন ?"

সুধা বলিলেন, "আপনারা কি বহু দিন হইতে বাগ্‌দত্ত হইয়া আছেন ?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ অনেক দিন হইতে; তবে দুর্ঘটনায় এত দিন কার্য্য হয় নাই। এবার ছুটী ফুরাইবার পূর্ব্বে মণিকাকে দয়া করিতে বলিতেছি, এখন ওঁর দয়া হইলেই হয়।"

সুধা কহিলেন, "মিস্ বসু, আপনি কিন্তু আশ্চর্য্য লোক, আপনি এমন ভাব দেখাইয়াছেন, যেন আপনি মিঃ রায়কে চিনিতেন না। আচ্ছা মজা হলো যা'হউক।" আমি সে ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলাম। মিঃ রায়কে সকলে চায়ের জন্য অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন, শুনিলাম।

পর দিন প্রাতঃকালে মিসেস্ বসু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সহসা আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এত দিন পরে আমার আশা পূর্ণ হলো, তোমার মুখ এ পর্য্যন্ত আমি এক দিনও ভুলিতে পারি নাই। এখন তুমি আমাদের আপনার হবে জানিয়া আমার প্রাণ সুস্থির হইল।"

আমি আনন্দে ও লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, "সুধীর বলেছেন, তোমায় আজ এখনি যেতে হবে, চল।"

আমি মুখ তুলিয়া বলিলাম, "মিসেস্ বসু, আমায় ক্ষমা করিয়াছেন ত ? এক সময় আমি আপনার কথা শুনি নাই, কিন্তু আপনি ত সব জানেন, আশা করি সে সব কথা আর কাহাকেও বলিবেন না।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "একজন ছাড়া, কি বল ? না ভাই, তোমার উপর আমার কিছু রাগ নাই। তোমায় প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিল সুরেশ তোমার উপযুক্ত নয়। এইবার তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে, এখন দেখ, তোমার মামীমা কি মনে করেন।"

আমি বলিলাম, "আজ পর্য্যন্ত ত মামীমার কোন সংবাদ পাই নাই।"

মিসেস্ বসু বলিলেন, "তুমি বুঝি জান না, তাঁরা এখন কলিকাতায় আছেন। এই দেখ না সুধীরের সঙ্গে বিবাহের সংবাদ পেলেই, তাঁরা তোমার কত আদর যত্ন কর্ব্বেন। আমার মাও কত খুসী হবেন।"

সে কথায় আমি আর কিছু বলিলাম না। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া মিসেস্ চৌধুরীর নিকট লইয়া গেলেন, তাঁহাকে বলিলেন, "আমি মণিকাকে এখনি লইয়া যাইতেছি, ইহাতে কি আপনার কোনও আপত্তি আছে ? সুধীর আপনার মেয়েদের জন্য একটি শিক্ষয়িত্রী স্থির করেছেন, সকাল দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত থাকিবে, বলিলে রাত দিনও থাকিতে পারে। সুধীর খানিক বাদে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন বলিয়াছেন।"

মিসেস্ চৌধুরীর মনের ভাব যাহা থাক্, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমার আপত্তি কি? আর এখন মিস্ বসুকে রাখা কি আমার সাধ্য ? দেখিবেন মিস্ বসু, আমাদের যদি কিছু দোষ হয়ে থাকে, কিছু মনে করিবেন না।"

"আমি আর কি মনে করিব বলুন ? আপনাদের দয়ার কথাই মনে করিব।"

মিস্ চৌধুরী বলিলেন, "আপনি আর আমাদের মনে রাখিবেন ? আপনি কত বড় সোসাইটিতে ঘুরিবেন, আমরা আপনার কাছে নগণ্য হইয়া পড়িব।"

আমার লজ্জায় আর কথা ফুটিল না। মিসেস্ বসু বলিলেন, "যাও মণিকা, শীঘ্র তোমার সাজসজ্জা করে এসো, এখনি যেতে হবে, এক জন হয় ত চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছেন।"

আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম দেখিয়া মিসেস্ চৌধুরী বলিলেন, "তা যান মিস্ বসু, লজ্জা কেন করিতেছেন, আপনার মত সৌভাগ্য কয় জনের হয় ?"

আমি সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলাম। সেই মিসেস্ বসু, যিনি আমার

উপর বিরক্ত হইয়া গৃহ ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, যিনি দুচার কথার পরেই 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, আজ এই যত্ন আদর কাহার জন্য? সেই এক জনের জন্য। সেই এক জনের কথা মনে পড়িলে আমার বক্ষে যেন দ্রুতগতিতে শোণিত প্রবাহিত হয়, আর যেন কোনও কথা মনে থাকে না। সেই এক জন আমার গোপন হৃদয়ের উপাস্য দেবতা ছিলেন, তিনি আমার হইবেন। একি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি?

আমি দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশ-বিন্যাস করিতেছিলাম; আপনাকে যেন আপনি চিনিতে পারিতেছি না, আনন্দে মুখের এত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা আমার যেন বিশ্বাস হয় না। চক্ষে এত জ্যোতি কোথা হইতে আসে? যে কথা লুকান ছিল, তাহা কি প্রকারে বাহিরে প্রকাশ পায়, আশ্চর্য্য!

আমি যতদূর সম্ভব সামান্ত বস্ত্রে সজ্জিত হইলাম, কয়েকটি ক্ষুদ্র ফুল লইয়া অঞ্চলে পিনসংলগ্ন করিলাম। মিসেস্ বসু পুনরায় আসিয়া দ্বারের নিকট হইতে বলিলেন, "কি মণিকা, তোমার যে আজ আর সাজসজ্জা শেষ হয় না!"

আমি বাহিরে আসিয়া মিসেস্ চৌধুরীদের নমস্কার করিলাম। সুধা বলিলেন, "ঈশ্বর আপনাকে সুখী করুন।" তাঁহার সেই মধুর আশীর্ব্বাদ যেন প্রাণে গাঁথিয়া গেল। শোভা ও লীলা আসিয়া আমায় জড়াইয়া ধরিল। তাহারা বলিল, "তুমি কেন যাবে মিস্ বসু, তুমি যাইও না।"

মিসেস্ চৌধুরী তাহাদের বলিলেন, "যাও, তোমরা এখন ঘরের ভিতর যাও, মিস্ বসু এখন তোমাদের কথা শুনিতে পারেন না।"

শোভা বলিল, "কখন আবার আসিবে বল, মিস্ বসু?"

আমি তাহাদের আদর করিয়া বলিলাম, "শীঘ্র আসিব।"

সুধা বলিলেন, "মিঃ রায়ের হুকুম না হইলে কি প্রকারে আসিবেন?"

মিসেস্ বসু ও আমি বাহিরে আসিলাম। জলা পাহাড় হইতে নামিয়া আমরা অকল্যাণ্ড রোডে পড়িলাম। আবার সেই অকল্যাণ্ড রোড। আমরা দুচারিটি বাটী ছাড়াইয়া যাইতে না যাইতে সেই পূর্ব্বের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম, "এই বাড়ী?"

মিসেস্ বসু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ এই বাড়ী। সুধীর অনেক বেশী ভাড়া দিয়া, এই বাড়ীটিই আমার জন্য ঠিক করেছেন।" কত প্রকার ভাব আসিয়া হৃদয়কে তরঙ্গিত করিয়া তুলিল। সেই গৃহ, এই গৃহেই প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই দীর্ঘ ঝাউ বৃক্ষের শ্রেণী, সেই সুন্দর প্রস্ফুটিত পুষ্প-কানন। আমরা ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিলাম। আমাকে লইয়া মিসেস্ বসু ড্রইং রুমে প্রবেশ করিলেন। আমরা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মিঃ রায় সেই কক্ষের একটি আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মিসেস্ বসু বলিলেন, "নাও ভাই সুধীর, তোমার জিনিষ বুঝে নাও।"

তিনি হাসিয়া মিসেস্ বসুকে বলিলেন, "তোমায় অনেক ধন্যবাদ।"

মিসেস্ বসু সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি আমার প্রতি চাহিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। উভয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত উভয়ের কর স্পর্শ করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

তাহার পর আর বলিবার বেশী কিছু নাই। আমার দুঃখের অবসান হইল। আমার জীবনের স্বপ্ন সত্য হইল। আমি যাঁহার উদ্দেশে আমার মন-প্রাণ বহু পূর্ব্বে সমর্পণ করিয়াছিলাম, তিনি আমার হইলেন। দার্জ্জিলিংএ আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। আমি যখন সিলন হইতে আসি, "মিসেস্ এস্, রায়" হইব বলিয়াই আসিয়াছিলাম, তাহাই হইলাম। মিসেস্ বসু বিবাহে অনেক ধুমধাম করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি কোন মতে তাহাতে সম্মত হই নাই।

বিবাহের পর আমার মামীমার নিকট হইতে পত্র পাইলাম; তিনি যে অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন, তাহা আমায় জানাইয়াছেন ও অনেক আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছেন। তাঁহার এই ব্যবহারে আমি সুখী হইলাম। এখন আর আমার কাহারও প্রতি বিরূপ ভাব নাই।

শুধু যে ঝড় আমায় সহিতে হইয়াছে, যে নৈরাশ্য আমায় বহিতে হইয়াছে, যে উপাসনা আমায় করিতে হইয়াছে, তাহা আমি জানি, আর আমার দেবতা জানেন। আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, সব দুঃখ অবসানে আমি এত সুখ পাইব।

আমার হৃদয় যখন এই অসীম আনন্দে পুলকিত হয়, তখন মনে হয়, আমি কত ক্ষুদ্র, কত দীন হীন, তবু সেই অলক্ষ্য হস্তের অযাচিত করুণার ধারা আমার প্রতি কি প্রবল ভাবেই প্রবাহিত হইতেছে! সেই করুণার বলে আজ আমি এত সৌভাগ্যবতী, এত সুখী হইয়াছি।

আমি এখন আর সে ছবিটি লুকাইয়া রাখি নাই, তাহা আমার শয়ন-কক্ষেই থাকে। এক একবার তিনি বলেন, "মণি, তুমি ছবিটিকে বেশী ভালবাস?"

আমি কি বলিব ভাবিয়া পাই না। ছবিটির কথা মনে হইলে আমার অনেক কথা মনে পড়িয়া যায়। ছবিটি না পাইলে কি আসলটি পাইতাম, না চিনিতাম?

আমার শুধু—

"ভালবাসা খেলা নয়, নহে সে স্বপন,
এ স্থির বিশ্বাসে হৃদি রয়েছে মগন!" (সমাপ্ত)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

---

## শোক-সঙ্গীত।

(ময়মনসিংহে স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহোদয়ের স্মরণার্থ মহিলা-সভায় গীত)

(১)

হে রবি! বঙ্গের রবি লয়ে অস্ত গিয়েছিলে,
তুমি ত এসেছ ফিরে, তারে কোথা রেখে এলে?
ডুবিতে দিনের আলো, সে আলোক নিভে গেলো,
জন্মভূমি জননীরে, ভাসায়ে নয়ন জলে।
হায় সেই দেব-দেহ—জ্ঞান গরিমার গেহ,
অনলে দিয়েছে সবে পুণ্য সুরধুনী-কূলে।
আজি ঊর্দ্ধপানে চাহি, বিষাদ-সঙ্গীত গাহি
শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেই মহিলা-সমাজ মিলে।

(২)

ধন্য রমণী তিনি, যিনি এ মণির খনি,
ধন্য এই বঙ্গভূমি পুণ্য জন্মস্থান।
হেন পুত্র যায় কোলে, ডাকে যারে মা মা বোলে
সৌভাগ্যশালিনী কেবা তাহার সমান।
আনন্দ কি সেই জানে, স্বর্গ সুখ তারি প্রাণে,
হেন পুত্র যার বুকে করে স্তন্য পান।
তাহারি সার্থক জন্ম, তাহারি সার্থক কর্ম্ম,
মরণের সনে যার নহে অবসান।

---

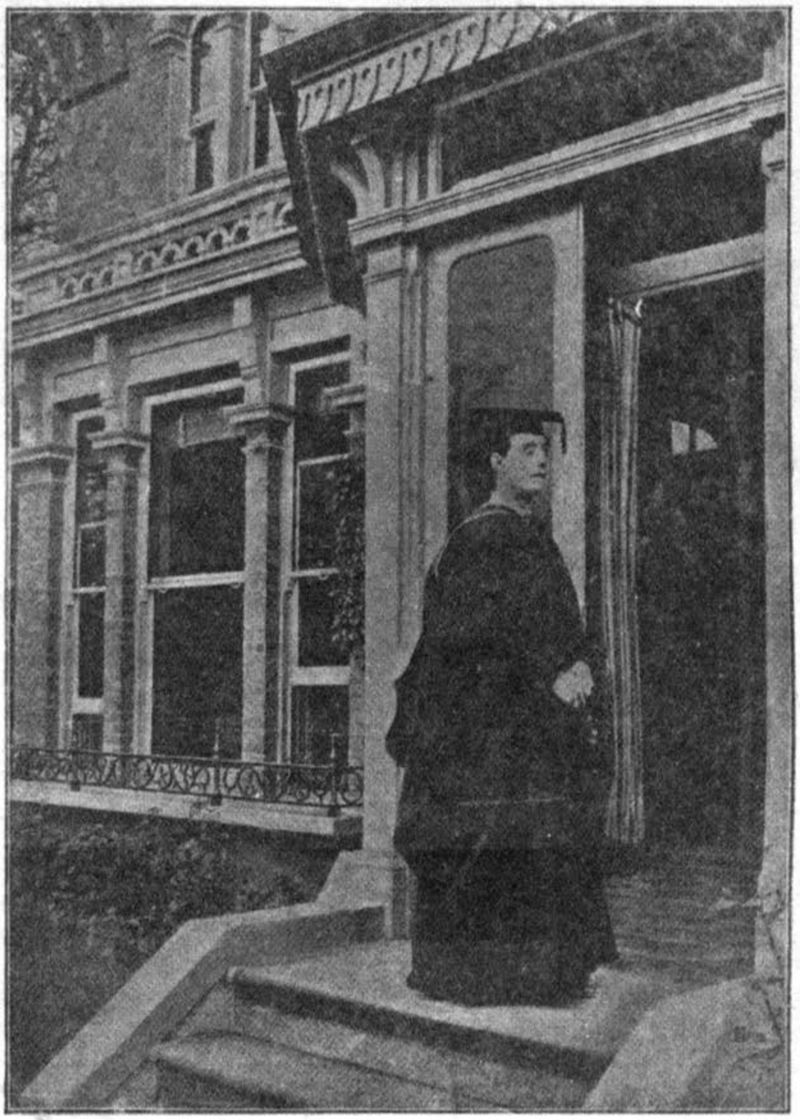
## কুমারী লুকাস।

অদ্য আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণকে একটী অন্ধ মহিলার প্রতিকৃতি উপহার দিতেছি। ইনি জন্মান্ধ, কিন্তু অধ্যবসায় বলে যন্ত্র-সঙ্গীতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া এখন সাধারণের প্রচুর শ্রদ্ধা ও সম্মান ভাজন হইয়াছেন এবং পরের গলগ্রহ না হইয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

কুমারী লুকাসের পিতা ইংলণ্ডের কোন পল্লীগ্রামের এক জন দরিদ্র পুরোহিত ছিলেন। অন্ধ কন্যাটী যাহাতে জীবনে সুখী হইতে পারে, সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে, এ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল ছিল; কিন্তু দরিদ্রতা বশতঃ ব্যয়সাধ্য অন্ধ-বিদ্যালয়ে তাঁহাকে প্রেরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অবশেষে জনৈক বন্ধুর প্রদত্ত অর্থসাহায্যে কুমারী লুকাস বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন।

লুকাস স্নেহময় সুপণ্ডিত শিক্ষকের উপদেশ মনপ্রাণে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে তিনি সন্তরণ, নৌচালন, বাইসাইকেল-আরোহণ প্রভৃতি শ্রমসাধ্য ব্যায়ামে দক্ষতা লাভ করেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

অন্ধদিগের জন্য উদ্ভাবিত "ব্রেইল"-প্রণালীতে অন্ধ-বিদ্যালয়ে তিনি লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করেন। ক্রমে ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার দক্ষতা জন্মে ও তিনি



উপাধি-গ্রহণ বেশে

অন্ধ কুমারী লুকাস, এফ, আর, সি, ও ; এল, আর, এ, এম্।

৮৮ (A)

"কুইন্স স্কলারসিপ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত-বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সাহিত্যাদি বিদ্যায় সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে তিনি বিবিধ বাদ্য যন্ত্র বাজাইতে শিক্ষা করেন এবং অর্গান যন্ত্রে নিপুণতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। কিন্তু এক জন অন্ধ মহিলার পক্ষে এরূপ চাকুরী পাওয়া অত্যন্ত কঠিন মনে করিয়া তাঁহার পরমহিতৈষী শিক্ষক এ বিষয়ে প্রথমে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু পিতার সাহায্যে তিনি কোন গির্জ্জায় চাকুরী পাইলেও পাইতে পারেন, এই মনে করিয়া তাঁহার পিতৃতুল্য স্নেহপরায়ণ শিক্ষাগুরু তাঁহার অর্গান শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সুকঠিন অর্গান বাদ্যে চাকুরী প্রাপ্তির উপযোগী নিপুণতা লাভ করা এক জন অন্ধের পক্ষে অতি দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু ঐকান্তিক মনোযোগ ও কঠিন পরিশ্রমবলে লুকাস তাহাতেও দক্ষতা লাভ করিলেন। বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতাদিগের দোকানে দোকানে যাইয়া হস্তে স্পর্শ করিয়া তিনি নানা শ্রেণীর অর্গানের গঠনপ্রণালী অনুভব করিতেন। এই প্রকারে চক্ষে দেখিতে না পাইলেও কোনও প্রকার অর্গানই তাঁহার নিকট আর নূতন রহিল না। কিন্তু অর্গান-বাদ্যে দক্ষতালাভ করিলেও চাকুরী প্রাপ্তি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইল। একে ত স্ত্রীলোক, তায় আবার অন্ধ। কিন্তু তাঁহার অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া সেই অন্ধ-বিদ্যালয়েই তাঁহাকে সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত "সেণ্ট এণ্ড্রু" গির্জ্জার অর্গানবাদক উচ্চতর বেতনে অন্য গির্জ্জায় চাকুরী লাভ করিলেন। তিনি কুমারী লুকাসের আশ্চর্য্য শক্তি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার ত্যক্ত পদে কুমারী লুকাসকে নিযুক্ত করিতে তিনি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সহজে এই গৌরব ও দায়িত্বপূর্ণ পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। অবশেষে স্থির হইল, কর্ম্মপ্রার্থীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, প্রতিযোগিতায় যিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন তিনিই কর্ম্ম লাভ করিবেন। বহু প্রথিতনামা বাদক এই উচ্চ পদ লাভের জন্য প্রার্থী হইলেন, কিন্তু কুমারী লুকাস্ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এখন প্রশংসা ও সম্মানের সহিত আপন পদগৌরব রক্ষা করিতেছেন।

কিন্তু জীবিকানির্ব্বাহের উপায় ও পদগৌরব লাভেই লুকাস্ সন্তুষ্ট হন নাই। অর্জ্জিত জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তিনি সর্ব্বদা মনোযোগিনী রহিয়াছেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি "রয়েল একাডেমির" পিয়ানো পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তৎপর আবার ১৯০২ খৃষ্টাব্দে "রাজকীয় অর্গান কলেজের" শেষ পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে সংগীত-বিদ্যার যথেষ্ট সমাদর। এই সকল কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের সম্মান সে দেশে সামান্য নহে। লুকাস্ একে স্ত্রীলোক, তাহাতে আবার জন্মান্ধ, তাঁহার পক্ষে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সামান্য অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বনের পরিচায়ক নহে।

---

# জাতীয় সাহিত্য।

বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এক শুভ চিহ্ন এই, যে দিন দিন দেশীয় সামগ্রীর প্রতি দেশের লোকের অনুরাগ জন্মিতেছে। দেশজাত যত প্রকার সামগ্রী আছে, তন্মধ্যে দেশীয় ভাষা এক দিকে যেমন অতীব প্রয়োজনীয়, অপর দিকে তেমনি মনুষ্য মাত্রেরই প্রিয় পদার্থ। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষা আমাদের আয়ত্ত হয়, মাতৃমুখে প্রথম এই ভাষা শুনিয়া আমাদের প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। যে দেশে এই ভাষার যত উন্নতি, সে দেশ সেই পরিমাণে শিক্ষিত, সভ্য ও পরিমার্জ্জিত। আমরা বহুকাল পরাধীনতার দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বৈদেশিকের মনস্তুষ্টি ও স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে শাসনকর্ত্তাদিগের ভাষা আয়ত্ত করিতে ও সেই ভাষাতে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে নিয়ত যত্নশীল হইয়া আপনার মাতৃ-ভাষার প্রতি তাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন করি নাই। ইহার ফল এই হইয়াছে, যে আমরা যতটা প্রাচীন সভ্যতার দোহাই দেই, আমাদের ভাষা ততটা প্রাচীনতা প্রমাণ

করে না। একথার একটা উত্তর অবশ্য এই আছে, যে বঙ্গভাষা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন, আমাদের সভ্যতার পরিমাণ বাঙ্গলা ভাষা দিয়া নহে, কিন্তু সেই সংস্কৃত ভাষাতে। যাহা হউক, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যে জাতীয় ভাবে বাঙ্গালী যতটা প্রাচীন, আমাদের বঙ্গভাষা ততটা প্রাচীনতার পরিচায়ক নহে। কিন্তু পরম সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় এই, যে গত এক শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গভাষার যে উন্নতি হইয়াছে তাহা অতিমাত্র আশাজনক। যে দেশে শত বৎসর পূর্ব্বে গদ্য রচনাই প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সে দেশের লোক যে এই অল্প সময়ের মধ্যে ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে গভীর চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে, বৈদেশিক ভাষা অনুবাদ করিয়া নানা রত্ন অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়াছে, এমন কি বাঙ্গালীরচিত দুই চারিখানি বাঙ্গলা গ্রন্থ বিদেশীয় ভাষাতে বৈদেশিক কর্ত্তৃক অনুবাদিতও হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক আত্মপ্রসাদের বিষয় কি হইতে পারে?

ইংরেজি শিক্ষা ও ইংলণ্ডীয় শাসন আমাদের বর্ত্তমান উন্নতির এক প্রধান উপাদান। কিন্তু কি গভীর পরিতাপের বিষয়, যে এই ইংরেজি শিক্ষা যখন প্রথম বঙ্গদেশে প্রচলিত হয় তখন শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী বৈদেশিক প্রেমে এতই আত্মহারা হইলেন, যে বাঙ্গলা ভাষাকে আদর করা দূরে থাক্, বাঙ্গলা ভাষাতে পরস্পর কথা বলা, বাঙ্গলায় সভা-সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহ করা ও পরস্পর পত্রাদি লেখা অতি হেয় ও হাস্যাস্পদ কার্য্য মনে করিতেন। ইংরেজি হাবভাব সহকারে, ইংরেজি কায়দায়, ইংরেজের ভাষা আয়ত্ত করিয়া আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজন ও স্বদেশবাসী অন্যান্য লোক অপেক্ষা একটা সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ হইয়া গিয়াছি, সে পার্থক্য বজায় রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, এই এক অপরূপ ধারণা সে সময়-কার শিক্ষিত বাঙ্গালীর চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল। যখন রাজপুরুষদিগের রাজনৈতিক স্বার্থ-সংঘর্ষণে প্রমাণ হইল, যে আমরা স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশবাসীদিগকে ঘৃণা করিয়া উন্নত রাজ্যে পহুঁছি নাই, যে ঘন-কৃষ্ণ তিমিরে ছিলাম তাই আছি, বরং শাসনকর্ত্তাদিগের হিংসা ও উপহাসের সামগ্রী হইয়াছি, তখন আমাদিগের চৈতন্যোদয় হইল, দেশের প্রতি ও দেশীয় ভাষার প্রতি একটু দৃষ্টি পড়িল। বাঙ্গলা ভাষার দুই চারিখানা গ্রন্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়ে আদৃত হইতে লাগিল, আপন সন্তানদিগকে বাঙ্গলা না শিখাইয়াই ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত করিবার প্রবৃত্তি ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। বাঙ্গালী স্ত্রী শিক্ষাভিমানী স্বামীর কাছে একটু আবদার করিবার সুবিধা পাইল। দেশের বিশেষ সৌভাগ্য বশতঃই এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্রপ্রমুখ বঙ্গের সুলেখকগণ অতি উপাদেয় কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; শিক্ষিত বাঙ্গালী হস্ত প্রসারণ করিয়াই সেই সমুদয় রত্নরাজি প্রাপ্ত হইলেন। চরিত্রহীন যুবকের জীবনী আলোচনা করিলে সময় সময় দেখা যায়, হতভাগ্য যুবকের ব্যভিচারে একবার অপ্রবৃত্তি জন্মিয়া বিবাহিতা পত্নীকে ভালবাসিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, সে বিষয়ে চেষ্টাও করিয়াছিল; কিন্তু পত্নী পরিচ্ছন্নতা ও বসনভূষণে অমনোযোগিনী, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী ও অভিমানিনী, সুতরাং যুবক তাদৃশী পত্নীতে তৃপ্তি পাইল না, পুনরায় পাপের গভীর পঙ্কে ডুবিল। ইংরেজি শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী যদি বঙ্গভাষার দিকে সতৃষ্ণ ভাবে চাহিয়া উপাদেয় গ্রন্থ পাঠ করিতে না পাইত, তবে সে চিরকালের মত এই ভাষার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ তৎকালীন বঙ্গভাষাতে এমন সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, যে শিক্ষিত, চিন্তাশীল বাঙ্গালী তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি পাইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত "তত্ত্ববোধিনী", "বঙ্গদর্শন," "বান্ধব" প্রভৃতি কতিপয় সাময়িক পত্রিকাতে সময়োপযোগী বহুবিধ বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছিল; সুতরাং ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী নিরাশায় প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বঙ্গভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে ও বাঙ্গালীর প্রাণে বঙ্গভাষার

প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে, বহুকাল হইতে "ব্রাহ্ম সমাজ" বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গলা গদ্যের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। দেশ বিদেশ হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া মধুচক্র রচনা করিতে হইবে, প্রাচীনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বর্ত্তমান সভ্যতা যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে হইবে, স্বদেশের লুপ্ত রত্ন সকল উদ্ধার করিতে হইবে, একটি সুসভ্য ও সুসংস্কৃত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তদুপযোগী সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন একটি ভাষা সৃষ্টি করিতে হইবে, প্রাণস্পর্শী প্রাঞ্জল ভাষাতে ধর্ম্মমত জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রচার করিতে হইবে—এই সকল আবশ্যকতা প্রযুক্ত "ব্রাহ্ম সমাজ" বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধনে প্রথম হইতে অদ্যাবধি নিযুক্ত আছে।

ইংলণ্ডগামী যুবকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতেও বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার হইয়াছে। কথাটা সহসা অত্যন্ত অসংলগ্ন মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা অতি সত্য কথা। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে বাঙ্গালী স্বীয় মাতৃভাষার মিষ্টতা অনুভব করে, বাঙ্গালী দেখিলেই আগ্রহ সহকারে বাঙ্গলা ভাষাতে কথা কহে, দেশে প্রত্যাগমন করিয়াও সে অভ্যাস পরিত্যাগ করে না। প্রয়োজন বশতঃই সর্ব্বদা এত ইংরেজি আলোচনা করিতে হয়, যে অপ্রয়োজনে বৈদেশিক ভাষাতে বৃথা আস্ফালনের আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই মন্দীভূত হইয়া আইসে। আর যাঁহারা বঙ্গদেশের বাহিরে পদার্পণ না করিয়াই সাহেব সাজিয়াছিলেন, বঙ্গভাষা বিষবৎ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই সকল বীরপুরুষেরাও ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বাঙ্গালীর মুখে বাঙ্গলা ভাষা শুনিয়া উৎকট সাহেবি-আনার মাত্রা হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

জাতীয় সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার আর একটী কারণ বিদেশীয় অভিজ্ঞতা। অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী বাঙ্গালী বিদেশীয় ভাষার প্রচুর আরাধনা করিয়া দেখিয়াছে, বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট আহরণ করা যায় বটে, কিন্তু বিদেশীয় ভাষাতে কৃতিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা, যশস্বী হওয়া, বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মধুসূদন বঙ্গভাষায় যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, বৈদেশিক ভাষা সমূহে, বিশেষতঃ ইংরেজি সাহিত্যেও তেমনি তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরেজি ভাষাতে তিনি গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাই প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাতে সাময়িক যথেষ্ট প্রশংসাও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সাময়িক প্রশংসা স্থায়ী যশে পরিণত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। অপর পক্ষে যতকাল বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, মধুসূদনের নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে সসম্মানে ও আন্তরিক প্রীতি সহকারে উচ্চারিত হইবে। সুতরাং যশোপার্জ্জনের (that last infirmity of noble minds) দিক হইতে দেখিলেও বাঙ্গালীর বঙ্গভাষার চর্চ্চা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

এই প্রকার নানা ঘটনার ভিতর দিয়া বিধাতার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আমরা এখন এরূপ অবস্থাতে আসিয়াছি, যে বিদেশী ভাষার সহায়তা ব্যতীতও আমাদের অধিকাংশ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু একথা বলিলে অতিরঞ্জিত হইবে, যে আমাদের ভাষা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইয়াছে। আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে আমাদের ভাষার নানা প্রকার অভাব রহিয়াছে। ভাষার অভাব বুঝিতে হইলে ভাষার আদর্শ কি তাহা অগ্রে পরিষ্কার বুঝিতে হইবে। যে ভাষার সহায়তায় জীবন্ত, বিকশিত চিত্তের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার ভাব ও অভাব এত সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে জনসমাজে ব্যক্ত করা যায়, যে উক্ত ভাষাবিৎ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে সক্ষম হয়, এবং অপর কোন ভাষার সহায়তা ব্যতীতও মানবের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার আয়তন ও প্রসার বৃদ্ধির কোন অন্তরায় না ঘটে, বরং ভাষা মনোবৃত্তি নিচয়ের স্ফুরণের সহায় হয়, সেই ভাষাকেই পূর্ণাঙ্গ ভাষা বলা যাইতে পারে। জাতীয় সভ্যতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি, মনোবিজ্ঞান ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিকাশ—সকলই অল্লাধিক পরিমাণে এই ভাষার উপর নির্ভর করে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সংঘর্ষণে আসিয়া পদে পদে আমাদিগের মনে হইতেছে, কি

করিয়া আমরা উন্নত হইতে পারি, প্রতীচ্যের সমান সমান হইতে পারি। আমাদের উন্নতির দিন নিকটবর্ত্তী বলিয়াই এই পিপাসা জন্মিয়াছে। যতদিন আমরা মৃতপ্রায় ছিলাম ততদিন এই পিপাসা ছিল না। অধুনা সামুদ্রিক অনুকূল বায়ু-প্রবাহে আমাদের দেহে জীবন-সঞ্চার হইতেছে; তাহারই শুভ চিহ্ন এই উন্নতি-পিপাসা। সুতরাং এই শুভ সময়ে আমাদিগকে এমন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে স্থায়ী উন্নতি লাভ হয়। এ বিষয়ে শিক্ষিত বঙ্গসমাজের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত কোন সুফলের সম্ভাবনা নাই। গত কয়েক বৎসরে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে কতিপয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার সভ্য-সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সভ্যদিগের শিক্ষা ও পদমর্য্যাদাও কম নহে। কিন্তু তথাপি আশানুরূপ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না। ইহার কারণ কি? প্রধান কারণ এই, যে প্রতিভা-শালী ব্যক্তি ব্যতীত ভাষা প্রস্ফুটিত হয় না। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে যেমন কুসুম প্রস্ফুটিত হয় না, বরং যে মুকুল স্ফুটনোন্মুখ, অকালে তাহাও বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনি জনকোলাহলে ভাষা ফোটে না, বরং ভাষার অপচয় হয়। মাইকেল বা বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে যদি দুই জন মাইকেল বা দুই জন বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন তাহা হইলে আমাদের ভাষা অপ্রতিহত বেগে উন্নতি-পথে ধাবিত হইত, সে বিষয়ে কি কাহারও সন্দেহ আছে? এখনও যে এই ভাষা জাগিয়া আছে, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি দুই চারি জন প্রতিভাশালী ব্যক্তির বর্ত্তমানতাই কি তাহার কারণ নয়? সুতরাং প্রতিভাশালী সাহিত্যসেবীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, সাহিত্যের সেই পরিমাণে উন্নতি হইবে। কেহ কেহ বলেন, প্রতিভা সৃষ্টি করা মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে, সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা, একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সত্য বটে আমরা ইচ্ছামাত্রেই ব্যক্তি-বিশেষকে প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারি না। কিন্তু সভ্য ও উন্নত সমাজের সমবেত চেষ্টায় সমাজমধ্যে প্রতিভার সৃষ্টি হয়, নিরন্তর ইতিহাস এ কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। যে সময়ে যে দেশে মনুষ্যপ্রকৃতির যে বিশেষ শক্তি সমধিক আদৃত হইয়াছে, সে সময়ে সে দেশে সেই বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধবিদ্যার চর্চ্চা যে সমাজে ও যে দেশে বিশেষ প্রচলিত সেখানেই যোদ্ধার জন্ম ও বিকাশ। যে যুগে কাব্যের সমধিক আদর সে সময়ে কবিকুলগৌরব প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের আবির্ভাব। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা তুলনায় অধিক সংখ্যক ধর্ম্মবীর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে জীবন্ত স্বদেশপ্রিয়তার ফলে যদি জাতীয় সাহিত্যের প্রতি আমাদের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, সাহিত্যসেবিগণ যদি সর্ব্বত্র যথোচিত সমাদৃত হন, ইংরেজী সাহিত্যের ন্যায় বঙ্গ সাহিত্য যদি ধনীর সুসজ্জিত প্রাসাদে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে আদৃত ও পঠিত হইতে থাকে, উচিত মূল্য প্রদান করিয়া বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থ, সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকাদি ক্রয় করিতে যদি কেহ কুণ্ঠিত না হন, তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে অচিরে বঙ্গদেশে প্রতিভাশালী লেখকের সংখ্যা দশগুণ বর্দ্ধিত হইবে ও বঙ্গভাষা সভ্যজগতের এক প্রধান ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীরমণীকান্ত দাস।

---

# নুরজাহান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পর দিন প্রাতঃকালে গীয়াসবেগ বাদশাহের পার্শ্বচর-দলভুক্ত হইলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার প্রধান অনুচর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তিন বৎসর কাল মধ্যেই আকবর তাঁহাকে সহস্র অশ্বারোহীর নায়কপদে নিযুক্ত করিলেন। ইহার দুই এক বৎসর পরেই তিনি সম্রাটের গৃহ-সংসারের কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইলেন। স্বকীয় প্রতিভা ও ভাগ্য-বলে পোনর বৎসর কাল মধ্যেই তিনি 'ইতমাদোদ্দৌলা' অর্থাৎ সাম্রাজ্যের প্রধান কোষাধ্যক্ষের পদ লাভ করিলেন। দারুণ অভাবে মরুভূমিতে যাঁহার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, এইরূপে পোনর বৎসরের

মধ্যে তিনি সাম্রাজ্যমধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পত্নীও আকবরের প্রধানা মহিষীর—শাহজাদা সেলিমের জননীর—অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁহারা উভয়ে একত্রে বসিয়া বাক্যালাপে অতিবাহিত করিতেন, বালিকা মিহর-উল-নিশা কাছে কাছে খেলা করিত।

এই পোনর বৎসরে মিহর-উল-নিশার দেহলতা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। তাঁহার মুখমণ্ডল যেন সৌন্দর্য্যের বিলাসভূমি হইয়া উঠিল। সেই অনিন্দ্য-সুন্দর বদনে শত মাধুরী নিরন্তর ক্রীড়া করিত। প্রতি ভ্রূভঙ্গে তাহাতে নব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইত। মনোহর ভ্রূশোভিত তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নযুগল যেন কোমলতা ও প্রীতিতে সর্ব্বদা উদ্ভাসিত থাকিত। তাঁহার তরঙ্গায়িত সুকৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশপাশ, চূর্ণকুন্তল-শোভিত বিশাল ললাট, সুগঠিত নাসিকা, তাঁহার বিম্বাধর, গোলাপ ও কমলের মিশ্রিত বর্ণের ন্যায় তাঁহার দেহের আভা বর্ণনা করিতে বর্ণনাপটু পারস্য কবিগণ পর্য্যন্ত পরাজিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ পৃথিবীতে এমন সৌন্দর্য্য-প্রতিমা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। মালেক মসুদ যে তাঁহার মিহর-উল-নিশা বা রমণী-সূর্য্য নাম রাখিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল।

এক দিন মনোরম প্রভাতে বাদশাহের অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে "মিনা বাজার" বসিয়াছে। অন্দর-মহলের মহিলাগণই এই বাজারের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইহা তাঁহাদের সখের বাজার, সেই সুন্দর উদ্যানের রাস্তাগুলি মার্ব্বেলমণ্ডিত। রাস্তার পার্শ্বে নয়নমুগ্ধকর কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া মধুর সুগন্ধ বিতরণ করিতেছিল। উদ্যানের নানা স্থানে জলের ফোয়ারা সকল স্ফটিক-মালার আকারে জল বিকীর্ণ করিতেছিল। স্থানে স্থানে রৌপ্য জালিকার উপর দ্রাক্ষালতা জড়াইয়া জড়াইয়া সুন্দর কুঞ্জ নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে পুষ্পপত্রশোভিত বিহারভূমিতে স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত টেবিলের উপর বরফ-মিশ্রিত উপাদেয় সরবৎ ও সুমিষ্ট ফল সজ্জিত রহিয়াছে। এই মনোহর বিলাস-কাননে অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী মহিলাগণ নানা সাজে সজ্জিত হইয়া প্রজাপতির মত বিচরণ করিতেছিলেন, যেন পৃথিবীতে স্বর্গের পরীগণ নামিয়া আসিয়া সেই উদ্যানকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছে।

অনেক সময় সম্রাট আকবর পত্নী সমভিব্যাহারে এই উদ্যানের কোন নির্জ্জন প্রান্তে বসিয়া গৌরব ও প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার রাজ্যের গৌরবস্বরূপ এই সকল আনন্দ-প্রতিমার প্রতি চাহিয়া থাকিতেন, আর সেই বিশ্বশিল্পীর সৌন্দর্য্য-রচনার বিষয় চিন্তা করিতেন। কখনো রেশমী-বস্ত্র-পরিহিতা কোন সুন্দরী মস্ মস্ শব্দে তাঁহার নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, সুন্দরীর তুঙ্গীকৃত কেশরাশির উপর লূতাতন্তুসদৃশ অবগুণ্ঠনে ক্ষিপ্র সূর্য্যকিরণ যেন স্থিরতা লাভ করিয়াছে। কখনো কোন মৃগনয়না সচকিত দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া সেই মুহূর্ত্তেই দ্রুতপদে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছেন, কোথাও কোন বিদ্যাধরীসদৃশ দিব্যসৌন্দর্য্যশালিনী রমণী কুসুমগুলিকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের সহিত কথা কহিতেছেন, তাঁহার প্রেমালস দৃষ্টি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিতেছে। স্বর্গের হোরীসদৃশ এই সকল রমণীমণ্ডলী-শোভিত উদ্যান বাস্তবিকই স্বর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। কবি সত্যই বলিয়া গিয়াছেন, "পৃথিবীতে যদি স্বর্গ সম্ভব হয় তবে ইহাই স্বর্গ।"

আনন্দকোলাহলে সে উদ্যান পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বহু সুন্দরী পণ্যবীথিকায় অপূর্ব্ব শিল্পকৌশলপূর্ণ নানা মূল্যবান দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে নিযুক্ত ছিলেন। কত জন রেশমীরজ্জুতে দোদুল্যমান দোলায় দোল খাইতেছিলেন; কেহ বা কুঞ্জে কুঞ্জে বসিয়া মনের আনন্দে তাঁহাদের সুকণ্ঠে আকাশ প্লাবিত করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধুর সঙ্গীতে, আর বন্য পাখীর সুললিত তানে সেই সকল কুঞ্জ মুখরিত হইতেছিল। মিহর-উল-নিশা এবং তাঁহার জননীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জননী যখন কথোপকথনে নিমগ্না মিহর-উল-নিশা তখন দূরে একাকী একটী ফোয়ারার পাশে বসিয়া ফোয়ারার জলে তাহার পদপল্লব ধৌত করিতেছিলেন। অতি রমণীয় বেশে তিনি সজ্জিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত মনোহর পোষাক তাঁহার দিব্য-সৌন্দর্য্য যেন আরো বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

ধীরে ধীরে একটী খিড়কী দ্বার দিয়া শাহজাদা সেলিম সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। অতৃপ্ত নয়নে তিনি কিছুক্ষণ সেই রমণীমণ্ডলীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন; তৎপর সসম্ভ্রমে দ্রুতপদে এক পাশ দিয়া উদ্যানের এক নির্জ্জন প্রান্তে চলিয়া গেলেন। সেখানে বৃক্ষের ছায়াবৃত সুশীতল স্থানে তিনি একাকী পদচারণা করিতে লাগিলেন।

সেলিমের বয়ঃক্রম তখন অষ্টাদশ বৎসর। তাঁহার দেহ কৃশ ও দীর্ঘ, কিন্তু সুগঠিত। তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, কটিদেশ ক্ষীণ। সুগৌর বদনমণ্ডল রৌদ্রতাপে কিঞ্চিৎ তাম্রবর্ণ ও পরুষতাপ্রাপ্ত। তাঁহার বহুল কেশরাশি কুঞ্চিত। তাঁহার সুনীল নয়ন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক, তাঁহার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। তাঁহার শুক-চঞ্চুর ন্যায় বক্র-ভাবাপন্ন নাসিকা দৃঢ় চরিত্রবলের পরিচয় দিতেছিল। তাঁহার সুগঠিত ওষ্ঠাধর দৃঢ়তাব্যঞ্জক। যদিও বয়সে নবীন, তথাপি ইতিমধ্যেই তিনি অত্যন্ত আমোদপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। বাক্যালাপে এবং আচার-ব্যবহারে তিনি অতি ভদ্র, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিতান্ত আরামপ্রিয়। অনেক সময় দিবানিশি মদ্যপানে বিভোর থাকিতেন। তিনি সামান্য বেশে সজ্জিত হইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মার্জ্জিতরুচি ও বিলাসিতার পরিচয় দিতেছিল।

ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতে করিতে, যে স্থানে মিহর-উল-নিশা ফোয়ারার জল লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন সেলিম হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মিহর-উল-নিশা ত্রস্তভাবে মসলিন-অবগুণ্ঠনে তাঁহার বদনকমল আবৃত করিলেন। সেলিম উদ্যানের সুন্দর ফুলগুলি দেখিয়া দুটী ফুল তুলিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার দুই হাতে দুটী শুকপাখী; নিকটে মিহরকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন :—

"ভগিনী, মুহূর্ত্তের জন্য তুমি আমার এই পাখী দুটী ধর, আমি দুটী ফুল তুলিয়া লই।" মিহর কোন উত্তর না করিয়া তাঁহার হস্ত প্রসারিত করিলেন। সেলিম পাখী দুটী তাঁহার হাতে দিয়া ফুল তুলিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া পাখী দুটী চাহিলেন।

মিহর বিনা বাক্যব্যয়ে এক হাতে একটী মাত্র পাখী সেলিমের সম্মুখে ধরিলেন। সেলিম বলিলেন, "একি? তোমার হাতে একটী মাত্র পাখী দেখিতেছি, আর একটী কোথায়?"

বীণাবিনিন্দি স্বরে মিহর উত্তর করিলেন, "উড়িয়া গিয়াছে।"

দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া সেলিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে উড়িয়া গেল?"

মিহর হস্তমুষ্টি শিথিল করিলেন, দ্বিতীয় পাখীটীও আকাশে উড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর করিলেন, "এইরূপে।" কিন্তু সেই গোলমালে হঠাৎ মিহর-উল-নিশার মুখাবরণ খসিয়া পড়িল। তাঁহার অতুল রূপরাশি সেলিমের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মৃগনয়নের সুমধুর চকিত দৃষ্টি সেলিমের উপর পতিত হইল। সেলিম বিস্মিত, স্তম্ভিত, মন্ত্রাহতবৎ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত হইল।

লজ্জায় আরক্তিম হইয়া মিহর-উল-নিশা উত্তর করিলেন :—"আমাকে ক্ষমা করুন, আমার অজ্ঞাতসারে আপনার শুক আমার হাত হইতে উড়িয়া গিয়াছে।"

সেলিম অসংলগ্ন ভাবে উত্তর করিলেন; "তুমি কি পরী? স্বর্গ হইতে এখানে আসিয়াছ?"

মিহর উত্তর করিলেন, "আমার পিতা বাদশাহের প্রধান কোষাধ্যক্ষ, তাঁহার নাম মির্জা গীয়াসবেগ ইতমাদোদ্দলা। শাহজাদা, আমি এখন আমার জননীর নিকট যাইব, পথ ছাড়িয়া দিন্।"

সেলিম উত্তর করিলেন, "সুন্দরী, তুমি আঁমার শুক ছাড়িয়া দিয়াছ, কিন্তু আমার হৃদয়কে বন্দী করিয়াছ। এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াও।" সেলিম তখন প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া মিহরের প্রতি তাঁহার প্রেম বর্ণন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, এই প্রথম দৃষ্টিতেই দৈব ইঙ্গিতের ন্যায় তিনি অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার অদৃষ্ট মিহরের জীবনের সঙ্গে জড়িত। তাঁহাকে জীবনের সঙ্গিনী না করিলে তিনি এজীবনে কিছুতেই সুখী হইবেন না।

সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্য, সকল রাজৈশ্বর্য্য, মিহরকে না পাইলে সকলই বৃথা। মিহর মাতার নিকট ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেলিম কিছুতেই তাঁহার পথ ছাড়িয়া দিলেন না। সেই শান্ত-স্নিগ্ধ সময়ে, সেই সুরম্য উদ্যানের নির্জ্জন প্রান্তে, বিগলিত হৃদয়ে প্রীতি-মধুর কণ্ঠে সেলিম মিহর-উল-নিশার কর্ণে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

চতুরা মিহর হাসিয়া বলিলেন, "শাহাজাদা, আপনি অবশ্যই আমাকে নির্ব্বোধ বালিকা মনে করিয়াছেন, তাই রাজ্যেশ্বর রাজা হইয়া দরিদ্রের সঙ্গে এতক্ষণ তামাসা করিতেছেন, এতক্ষণে অবশ্যই আপনার কৌতুক-প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি হইয়াছে, এখন আমাকে যাইতে দিন্।"

সেলিম উত্তর করিলেন, "আমার হৃদয়ের ভাব আমি কিরূপে তোমাকে বুঝাইব ? যদি তুমি বুঝিতে পারিতে তবে নিশ্চয়ই এমন নিষ্ঠুরের মত কথা বলিতে না।"

মিহর উত্তর করিলেন, "শাহাজাদা, আমি দরিদ্রের কন্যা, আমাকে যাইতে দিন্। যদি কেহ আসিয়া এখানে আমাকে আপনার সঙ্গে দেখিতে পায়, আমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

সেলিম দৃঢ় ভাবে উত্তর করিলেন :—"কেহ তোমার নিন্দা করিতে সাহসী হইবে না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া তোমায় ভাল বাসিয়াছি, তুমি আমাকে গ্রহণ না করিলে এজীবন ব্যর্থ হইবে।"

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে মিহর-উল-নিশা উত্তর করিলেন,—"শাহজাদা, আপনার হৃদয়ের প্রেম ব্যক্ত করিবার জন্য আপনি অনেক বাক্যব্যয় করিয়াছেন, আমার হৃদয়ও অভেদ্য নয়। কিন্তু ইহা আপনার চিত্তের চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী ভাব মাত্র। ইহা কখনও আপনার হৃদয়ের স্থায়ী ভাব হইতে পারে না। দু দিনেই ইহার নিবৃত্তি হইবে।"

সেলিম উত্তর করিলেন, "মানব হৃদয়ের প্রেম যতদূর গভীর হইতে পারে, আমার প্রেম ততদূর গভীর। এই দেখ আমার জীবন দিয়া আমি আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছি।"—হতাশ হৃদয়ে সেলিম বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিলেন। স্বীয় বক্ষে তাহা বিদ্ধ করিবার জন্য সবেগে হস্তোত্তোলন করিবা-মাত্র ক্ষিপ্রহস্তে মিহর সেলিমের হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইলেন। প্রেমার্দ্র হৃদয়ে মিহর তখন বলিলেন,—"শাহজাদা, আপনি যদি আপনার পবিত্র প্রেম আমাকে অর্পণ করেন, আমি মনপ্রাণে আপনাকে ভালবাসিতে পারি।"

আনন্দোৎফুল্ল নয়নে সেলিম উত্তর করিলেন :—"তুমি এই কথা বলিতেছ ? তবে তুমি আমাকে ভালবাসিবে অঙ্গীকার করিতেছ ?"

মিহর উত্তর করিলেন :—"আপনার গভীর প্রেম আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। কিন্তু আপনি জানেন, আমি সম্পূর্ণরূপে আমার পিতামাতার অধীন।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেলিম উত্তর করিলেন, "সে জন্য ভাবনা নাই, সে ভার আমার উপর। এখন হইতে তুমি আমার।"

কম্পিত বক্ষে, অবনত বদনে মিহর-উল-নিশা বলি-লেন, "যুবরাজ, আমি আপনার হইব, কিন্তু এখন আমায় যাইতে দিন।"

সেলিম পথ ছাড়িয়া দিলেন, মিহর মাতৃ-সন্নিধানে চলিয়া গেলেন। অপরাহ্নে মাতা ও কন্যা শিবিকারোহণে গৃহে গমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

---

## মহাত্মা বদরুদ্দীন তায়েবজী।

আমাদের দুর্দ্দশামগ্ন জন্মভূমি সম্প্রতি যে কয়েকটী সন্তানরত্নে বঞ্চিত হইয়াছেন, বোম্বাই হাইকোর্টের মুসলমান জজ মহাত্মা তায়েবজী তন্মধ্যে এক মহারত্ন। ধনে, মানে, পদগৌরবে ও রাজ-প্রসাদে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক এদেশে অনেক আছেন, কিন্তু মহাত্মা তায়েবজীর ন্যায় বীরহৃদয় মহাপ্রাণ ব্যক্তি এদেশে অতি অল্পই আছেন। ভারতের মুসলমান সমাজে বোধ হয় তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই নাই।

বদরুদ্দীন তায়েবজী ভারতবাসীদিগের মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার যোগ্যতার পুরস্কার-

স্বরূপে তাঁহাকে বোম্বাই হাইকোর্টের জজিয়তী পদ প্রদান করেন। নির্ভীক ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক রূপে তিনি এই পদে সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার স্বদেশবাসীগণ তাঁহাকে জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির পদে বরণ করেন। তদুপলক্ষে তৎপ্রদত্ত বক্তৃতা তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়স্থল হইয়া রহিয়াছে। রাজপদ লাভের পর রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁহার আর যোগদানের অধিকার ছিল না, কিন্তু তখনও তিনি জাতীয় মহাসমিতির সহিত আপনার সহানুভূতি প্রদর্শনে কিছুমাত্র ভীত হইতেন না। দেশের ও আপন সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য তায়েবজী যেরূপ দূরদর্শিতা সহকারে চিন্তা করিতেন এদেশে তাহার তুলনা দুর্লভ। তিনি জানিতেন, নারীজাতির উন্নতি না হইলে কিছুতেই এদেশের কল্যাণ নাই। কিন্তু শুধু বিশুদ্ধ সংস্কৃত মত প্রচার করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। অসম সাহসিকের ন্যায় সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মতের বিরুদ্ধে তিনি আপন পরিবার হইতে অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমান সমাজে অবরোধপ্রথার দারুণ অত্যাচার এদেশে সর্ব্বত্র বিদিত। তায়েবজীর মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে আপন পরিবারস্থ মহিলাদিগকে প্রকাশ্যে বাহির হইতে দেওয়া অদ্ভুত নৈতিক বীরত্বের পরিচায়ক। ইংরেজীতে Epoch maker বা "যুগপ্রবর্ত্তক" নামে একটা কথা আছে; এ দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কার কার্য্যে মহাত্মা তায়েবজী নিঃসংশয়ে এই 'যুগপ্রবর্ত্তক' মহাপুরুষ। তাঁহার কন্যাগণকে ও পরিবারস্থ মহিলাগণকে তিনি ইংরেজী ও উর্দ্দু ভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই কন্যা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিতেছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের চিরাগত প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া এই সকল সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় মুসলমান সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু বীরহৃদয় তায়েবজী তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হন নাই। অকুতোভয়ে তিনি স্বীয় বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গগৌরব ভারতের প্রথম র‍্যাঙ্গলার মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের প্রায় সমসময়েই ভারতের প্রথম ব্যারিষ্টার বদরুদ্দীন ইংলণ্ডে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এ দেশের মুসলমান-সমাজে মহাত্মা বদরুদ্দীন তায়েবজীর মত প্রকৃত সমাজসংস্কারক আর কত দিনে আবির্ভূত হইবেন, ভগবান্ জানেন।

---

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

**বঙ্গব্যবচ্ছেদ-দিবস**—লর্ড কার্জ্জনের অপরিণামদর্শিতায় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর বাঙ্গালীর উন্মেষোন্মুখ জাতীয় জীবনের প্রথম স্ফুরণ হইয়াছিল; বাঙ্গালির জাতীয় ইতিহাসে ইহা অতি পবিত্র দিন। গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বঙ্গের নানা স্থানে এই দিনে "রাখিবন্ধন" অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতায় সে দিন প্রায় সকল দোকান-পাটই বন্ধ ছিল, হাট একবারেই বন্ধ ছিল। বহু গৃহে সে দিন অ-রন্ধন ছিল। সমস্ত দিন গায়ক দল পথে পথে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে ২৯৪ নং আপার সার্কুলার রোডে "জাতীয় মিলন-মন্দিরের" ভূমিতে এক মহা সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক সেখানে সমবেত হইয়াছিল। মুশলমান সমাজের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত সৈয়দ মহম্মদ ইউসুফ সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। শোনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এই মহাসভার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন যে অসার নহে, গবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। মফঃস্বলের কোন কোন স্থলে মহিলাগণও সভা করিয়া দেশের কল্যাণ চিন্তা করিয়াছিলেন। কলিকাতার ইংরেজ-পরিচালিত দৈনিক পত্রিকা "এম্পায়ার" এতদুপলক্ষে লিখিয়াছেন, "যদি অন্তঃপুরেও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবেশ করে, তবে আর আন্দোলনের গুরুত্ব বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।" কলিকাতায় এবং বঙ্গের অন্যান্য প্রধান প্রধান স্থানে মহিলাগণ যে এবার বিশেষ ভাবে কিছু করেন নাই, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।



সান্ত্বনা দেবী ও পুত্রশোকাতুরা জননী।

# ভারত-মহিলা

> The woman's cause is man's; they rise or sink
> Together, dwarfed or God-like, bond or free;
> If she be small, slight-natured, miserable,
> How shall men grow?
>
> *Tennyson.*

২য় ভাগ। } অগ্রহায়ণ, ১৩১৩। { ৪র্থ সংখ্যা।

## ঋগ্বেদের দেবতাগণ।

### তৃতীয় প্রস্তাব।

#### ইন্দ্রের অস্ত্র।

ইন্দ্র বজ্রধারী রূপে ভারতীয় বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে বিশ্রুত। বিশ্বকর্ম্মা ত্বষ্টা সেই বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন :—

> অস্মা ইদু ত্বষ্টা তক্ষদ্বজ্রং স্বপস্তমং স্বর্য্যং রণায়।
> বৃত্রস্য চিদ্বিদদ্যেন মর্ম্ম তুজন্নীশানস্তুজতা কিয়েধাঃ ॥ ১।৬১।৬

যুদ্ধার্থ হনন-সাধন এবং শব্দকারী বজ্র ইন্দ্রের নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা শাণিত করিয়াছিলেন, শত্রুদিগকে হিংসা করতঃ ঐশ্বর্য্যশালী এবং বলবান ইন্দ্র বৃত্রাসুরের মর্ম্মস্থানে সেই বজ্রদ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন।

কিন্তু কোন কোন স্থলে কাব্য-উশনা ইন্দ্রের বজ্রনির্ম্মাণকর্ত্তা রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন :—

> ত্বমিন্দ্র নর্য্যো যাঁ অবো নৃম্ণস্তিষ্ঠা বাতস্য সুযুজো বহিষ্ঠান্।
> যং তে কাব্য উশনা মন্দিনং দাদ্বৃত্রহণং পার্য্যং ততক্ষ বজ্রং ॥ ১।২১।১২

হে ইন্দ্র, তুমি মনুষ্যের বন্ধু, তুমি যে অশ্বগণকে রক্ষা কর, সেই বায়ুতুল্য সুসংযুক্ত ও বহনকারী অশ্বে আরোহণ কর। কাব্য-উশনা তোমাকে যে মদকর বজ্র দিয়াছিলেন সেই বৃত্রঘাতক শত্রুদমনসমর্থ বজ্র তুমি তীক্ষ্ণ করিয়াছ।

এই বজ্র কোন কোন স্থলে সুবর্ণনির্ম্মিত বলিয়া উল্লিখিত আছে :—

> অধ তে বিশ্বমনু হাসদিষ্টয় আপো নিম্নেব সবনা হবিষ্মতঃ।
> যৎ পর্ব্বতে ন সমশীত হর্য্যত ইন্দ্রস্য বজ্রঃ শ্নথিতা হিরণ্যয়ঃ ॥ ১।৫৭।২

হে ইন্দ্র, যে কালে শত্রুবধাভিলাষী ইন্দ্রের সুবর্ণময় রিপুঘাতক বজ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিল সেই অবধি এই সমুদয় বিশ্ব আপনার যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নিম্নদেশগামী জলের ন্যায় যজ্ঞসম্ভার সকল আপনাকে দ্রুত ভজনা করে।

কিন্তু অনেক স্থলে ইন্দ্রের বজ্র আয়স অর্থাৎ লৌহ-নির্ম্মিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অষ্টকের দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তে সব্য ঋষি বলিতেছেন,

> জঘন্বা উ হরিভিঃ সংভৃতক্রতবিন্দ্র বৃত্রং মনুষে গাতুয়ন্নপঃ।
> অযচ্ছথা বাহ্বোর্ব্বজ্রমায়সমধারয়ো দিব্যা সূর্য্যং দৃশে ॥

হে যজ্ঞনির্ব্বাহক ইন্দ্র, মনুষ্যের নিমিত্ত পথ ইচ্ছা করিয়া অশ্ব সকলের সহিত যুক্ত হইয়া আপনি বৃত্রাসুরকে হনন করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে বৃত্র কর্ত্তৃক

নিরুদ্ধ জলপ্রবাহ মুক্ত করিয়াছিলেন। আপনি দুই হস্তে লৌহময় বজ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং আমাদিগের সকলের নিমিত্ত দ্যুলোকে সূর্য্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

কোন কোন স্থলে বজ্র চতুরশ্রি ( চতুষ্কোণ ), কোথাও বা শতাশ্রি ( শতকোণ ), অন্যত্র সহস্রভৃষ্টি অর্থাৎ সহস্রধারাযুক্ত।

স্থল বিশেষে ইন্দ্র ধনুর্দ্ধারী। তিনি অঙ্কুশও ধারণ করেন:—

দীর্ঘস্তে অস্ত্বঙ্কুশো যেনা বসু প্রযচ্ছসি যজমানায় সুন্বতে ॥ ৮।১৭।১০

হে ইন্দ্র, যদ্দ্বারা সোমাভিষবকারী যজমানকে ধন দান কর সেই সৃণিরাকর্ষণ-সাধন আয়ুধ দীর্ঘ হউক।

সায়নাচার্য্যের ভাষ্য অনুসারে এই ঋক্ অনুদিত হইল। কিন্তু অঙ্কুশ শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পণ্ডিত রোডল্ফ্ রোট্ (Rudolph Roth) তাঁহার St. Petersburg Sanskrit-Worterbuch এ বলেন, যে বৈদিক প্রয়োগে অঙ্কুশ শব্দের প্রকৃত অর্থ haken, ( আঁকড়া ) অথর্ব্ববেদেও ইন্দ্রের অঙ্কুশের কথা উল্লিখিত আছে:—

যস্তে অঙ্কুশো বসুদানো বৃহন্নিন্দ্র হিরণ্যয়ঃ।
তেন জনীয়তে জায়াং মহ্যং ধেহি শচীপতে ॥ অথর্ব্ববেদ ৬।৮২।৩

হে শক্তিশালিন্ ( ইন্দ্র ), তোমার যে স্বর্ণ নির্ম্মিত অঙ্কুশ ধন দান করে, তদ্দ্বারা আমাকে এক পত্নী প্রদান কর।

অথর্ববেদ মতে ইন্দ্র যুদ্ধে জাল অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেন:—

অন্তরিক্ষং জালমাসীজ্জালদণ্ডা দিশো মহীঃ।
তেনাভিধায় দস্যূনাম্ শক্রঃ সেনামপাবপৎ ॥ ৮।৮।৫

অন্তরিক্ষ জাল ছিল এবং পৃথিবীর দিক সকল জালদণ্ড ছিল, শক্র তদ্দ্বারা দস্যুদের সৈন্যগণকে পরিবৃত ও পরাস্ত করিয়াছিলেন।

পুরাণে দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা বজ্র নির্ম্মাণের যে কল্পনা আছে, বেদে তাহার কোন উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা পরবর্ত্তী কল্পনা।

সোমরস।

ইন্দ্রের সোমপান অতি প্রসিদ্ধ। এই সোমরস কি পদার্থ? কোন কোন পণ্ডিত বলেন, যে পুঁইশাকের যেরূপ তন্তু ( আঁশ ) থাকে সোমলতারও তাহাই ছিল। ইহাকে সোমতন্তু কহে। উদ্ভিদ্ বিদ্যায় ইহাকে asclepias acida কহে। এই সোমলতা হইতে রস বাহির করিয়া, ছাঁকিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করা হইত এবং তৎপরে জল মিশ্রণে কিঞ্চিৎ তরল করিয়া যবের সঙ্গে মিশ্রিত করা হইত। তদনন্তর এই মিশ্রণ নয় দিবস পর্য্যন্ত উচ্ছলিত অর্থাৎ মাদক অবস্থায় (fermented) পরিণত করা হইত। এইরূপে প্রস্তুত সোমরসের মাদকতা অতিশয় প্রবল ছিল। আর্য্যগণ যখন দেখিতে পাইলেন, যে সোমরস অতিশয় উত্তেজনাকারী পানীয় দ্রব্য, তখন স্বভাবতঃই মনে করিলেন যে দেবতারাও ইহা পান করিয়া নিশ্চয়ই উল্লাসিত হইবেন। অতএব ইহা পান করিয়া দেবতারা প্রভূত শক্তিসাপেক্ষ অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারিবেন এবং সাতিশয় পরিশ্রমের পর ক্লান্তি দূর করিতে পারিবেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস্ বলিয়াছেন, যে মানুষ নশ্বর দেবতা এবং দেবতারা নশ্বর মানব। আর্য্যগণের ব্যবহারে এই বাক্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহারা নিজে যাহাই ভাল মনে করিতেন, দেবতাদেরও তাহাই প্রীতিকর জ্ঞান করিতেন।

উপাসকগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ইন্দ্র স্ব-রথে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহার অশ্বগণের জন্য প্রচুর তৃণ প্রস্তুত থাকে, এবং তাঁহার জন্য সোমরস প্রদান করা হয়:—

স্তীর্ণং তে বর্হিঃ সুত ইন্দ্রসোমঃ কৃতা ধানা অত্তবে তে হরিভ্যাং। ৩।৩৫।৭

হে ইন্দ্র, তোমার উপবেশনার্থ বর্হি বিস্তৃত, এবং সোমরস অভিষুত হইয়াছে। তোমার অশ্বদ্বয়ের ভক্ষণার্থ ভৃষ্টযব প্রস্তুত হইয়াছে।

ইন্দ্র সোমপান করিয়া উত্তেজিত হন; তাঁহার রণনৈপুণ্য এবং সাহস বৃদ্ধি হয়। সূর্য্যকিরণ যেমন বায়ুমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হয়, সোমরস তদ্রূপ ইন্দ্রকে শক্তিতে পূর্ণ করে। দেবতাগণ সোমরস পানার্থ যজ্ঞস্থলে দ্রুতবেগে আগমন করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে:—

মাদ্যন্তীব বৈ মধ্যন্দিনে দেবতাঃ সমেব তৃতীয়সবনে মাদয়ন্তে।

দেবতাগণ তৃপ্রহরের আহুতিতেই প্রচুর পরিমাণে পান করিয়া থাকেন, এবং তজ্জন্য তৃতীয় সবনে সম্পূর্ণরূপে মাতাল হইয়া থাকেন। কিন্তু সোমপানে ইন্দ্রই বিশেষ পটু :—

ইন্দ্র ইৎসোমপা এক ইন্দ্রঃ সুতপা বিশ্বায়ুঃ অন্তর্দে বান্‌মর্ত্ত্যাংশ্চ। ৮।২।৪

দেবতা এবং মনুষ্যের মধ্যে ইন্দ্রই একমাত্র সোমপাতা, অভিষুত সোমপাতা ; তিনিই বিশ্বায়ু।

ইদম্ তে অন্নং যুজ্যং সমুক্ষিতং তস্যেহি প্র দ্রবা পিব। ৮।৪।২

তোমার এই প্রিয় ভক্ষ্যবস্তু পাত্রে আসিক্ত হইয়াছে ; সত্বর আইস এবং ইহা পান কর।

বাস্তবিক সোমপান ইন্দ্রের জীবনধারণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মাতা তাঁহার জন্মদিনেই ইহা তাঁহাকে পান করিতে দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি একবারে ত্রিংশৎ পাত্র সোম পান করিয়াছিলেন :—

একয়া প্রতিধাপিবৎ সাকং সরাংসি ত্রিংশতং ইন্দ্রঃ সোমস্য কাণুকা ॥৮।৭৭।৪

ইন্দ্র একবারে সোমপূর্ণ ত্রিংশত পাত্র পান করিলেন।

সোমপানের সময় তিনি গোমাংস ভক্ষণ করিতেনঃ—

অদ্রিণা তে মন্দিন ইন্দ্র তুয়ান্ সুন্বন্তি সোমান্ পিবসিত্বমেষাম্।
পচন্তি তে বৃষভা অৎসি তেষাং পৃক্ষেণ যন্মঘবন্ হূয়মানঃ ॥ ১০।২৮।৩

হে ইন্দ্র, যজমানগণ তোমার জন্য প্রস্তর দ্বারা সত্বর উল্লাসকারী সোমরস প্রস্তুত করে ; তাহাদের সোমরস তুমি পান কর। তাহারা তোমার জন্য বৃষমাংস রন্ধন করে ; হে মঘবন্, ঘৃতমিশ্রিত খাদ্য সহিত আহূত হইয়া তুমি তাহা ভক্ষণ কর। সায়ন বলেন :—

হে ইন্দ্র, তে ত্বদর্থং মন্দিনো মাদয়িতৄন্ তূয়ানবিলম্বিতান্ সোমান ত্রিণাভিষবগ্রাব্ণা সুন্বন্তি যজমানা অভিষুন্বন্তি। এষামস্মদাদি যজমানানাং সম্বন্ধিনঃ সোমান্ ত্বং পিবসি। কিঞ্চ ত্বদর্থং বৃষভান্ পশুন্সেচ যজমানাঃ পচন্তি তেষাং সম্বন্ধিনঃ হবির্ভূতান্ পশুনৎসি ভক্ষয়সি। হে মঘবন্ ধনবন্নিন্দ্র, ত্বং যদা পৃক্ষেণ হবির্ভূতান্নেন নিমিত্তেন হূয়মানো যজমানৈহূ্র্যসে তদেতে পূর্ব্বেন সম্বন্ধঃ।

সোমপানান্তর ইন্দ্র কিরূপ শক্তিশালী, কার্য্যদক্ষ এবং উল্লাসিত হন তাহা ১০।১১৯।১—১৩ ঋকে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। অনুবাদ মাত্র দেওয়া গেল।

"আমি বাস্তবিকই স্তোতৃগণকে গো এবং অশ্ব প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমি অনেক বার সোমপান করিয়াছি। মৎপীত সোম প্রবল বায়ুর ন্যায় আমাকে চালায় ; আমি অনেকবার সোমপান করিয়াছি। ক্ষিপ্রগামী অশ্ব যেমন রথ চালায়, পীত সোম তদ্রূপ আমাকে চালায়, আমি অনেক বার সোমপান করিয়াছি। হম্বারবকারী গাভী যেমন তাহার প্রিয় বৎসের কাছে যায়, তদ্রূপ উপাসকের স্তুতি আমার কাছে আসিয়াছে। আমি বহুবার সোমপান করিয়াছি। তষ্টা (সূত্রধর) যেমন সারথি-নিবাসস্থান বা রথ মেরামত করে, আমি তদ্রূপ উপাসকের স্তুতি মনে মনে চিন্তা করি। আমি বহুবার সোমপান করিয়াছি। নিষাদপঞ্চম চতুর্ব্বর্ণ আমার কাছে কণাবৎও বোধ হয় না ; আমি বহুবার সোমপান করিয়াছি। স্বর্গ এবং পৃথিবী আমার অর্দ্ধাংশেরও সমান নয় ; আমি বহুবার সোমপান করিয়াছি। আমি স্বমহিমায় স্বর্গ এবং বিস্তৃত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ; আমি বহুবার সোমপান করিয়াছি। আমি এই পৃথিবীকে এখানে অথবা অন্যত্র স্থাপন করিতে পারি ; আমি বহুবার সোমপান করিয়াছি। এই পৃথিবীকে পুনঃপুনঃ এখানে অথবা অন্যত্র আঘাত করি ; আমি বহুবার সোমপান করিয়াছি। আমার এক পক্ষ স্বর্গে স্থাপিত, অন্য পক্ষ অধোদেশে আকৃষ্ট হইয়াছে ; আমি বহুবার সোমপান করিয়াছি। আমি মহান্, অন্তরিক্ষে উদ্গত ; আমি বহুবার সোমপান করিয়াছি। হবিগ্রহীতা আমি অলঙ্কৃত হইয়া দেবতাদের হব্যবাহনরূপে যাই ; আমি বহুবার সোমপান করিয়াছি।"

শ্রীরাজকুমারী দাস।

---

# ছোট বৌ।

১

কাশীর বাঙ্গালীটোলা নামক পল্লীতে, জয়গোপাল তর্কভূষণ নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তর্কভূষণ মহাশয় কোন ক্রিয়া উপলক্ষে শিষ্যবাটী গিয়াছেন। শীতকালের সকাল বেলা, তর্কভূষণ মহাশয়ের গৃহিণী স্নানান্তে তসর পরিধান করিয়া ছাতে রৌদ্রে আহ্নিক

করিতে বসিয়াছেন, অনতি দূরে তাঁহার অল্পবয়স্ক পৌত্র-পৌত্রী খেলা করিতেছে। বড় বৌ রন্ধনশালায়, রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃতা; ছোট বৌও সেইখানে বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন। দুই জায়ে নানা রূপ কথাবার্ত্তাও চলিতেছিল। কথায় কথায় ছোট বৌ বলিলেন, "দিদি, এবারে পূর্ণকুম্ভ, প্রয়াগে অনেকেই স্নান করতে যাচ্ছে, আমাদেরও গেলে হয় না?"

বড় বৌ, ক্ষুণ্ণস্বরে উত্তর দিলেন, "পাগল আর কি! আমাদের আবার কে নিয়ে যাবে? আর শুন্‌ছি সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড় হবে, সেখানে যাওয়া কি আমাদের পোষায়?"

"বেশ দিদি! তুমিই যখন সব কাটিয়ে দিলে তখন আর ওঁদের কি বলা হবে? তীর্থস্থানে যাব, নে যাবেন না কেন? এত আর বে বাড়ী কুটুম বাড়ী নয়, যে নেমন্তন্নো না করলে কি করে যাব। আর দিদি! তুমি যে ভীড়ের কথা বলছো, তা মনে কর গেরনের সময় দশাশ্বমেধের ঘাটে কি কম ভীড়টা হয়, তা বাবা ত আমাদের গঙ্গা নাইতে যেতে দেন। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার মন্দিরে এক এক বার কেমন ভীড় হয়, তা বলে কি আমরা ঠাকুর দর্শন করতে যাই না?"

ছোট বৌয়ের নজীর শুনানির সম্মুখে বড় বৌ পরাস্ত হইলেন, বলিলেন, "বেশ ত, তুমি ঠাকুর পোকে ব'লে ক'য়ে ঠিক কর না, যাবার সময় আমাকেও সঙ্গে নিও, এই বারে আমি ডালটা সাঁতলাই। ওই যা! তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে ছোলার ডালটাতে একটু মিষ্টি দিলুম কি না তা মনে হচ্ছে না।"

ছোট বৌ কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ঝি এক চেঙ্গারী বাজার লইয়া আপন মনে কত কি বকিতে বকিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বড় বৌ বলিলেন "কি বকছিস্‌লো?"

"আমর লক্ষীছাড়ী মাগীর মুয়ে আগুণ! হাদে দেখ বড় বৌঠান! তরকারীগুলি মাগীটে গো, ম'লে যেন গতি হয় না, এই আলুর সের তিন পয়সা গো, আর মাগী কি না আমাকে ঠকিয়ে সাত পয়সায় দু'সের আলু দিলে গা।"

"রক্ষে পাই! আমি বলি না জানি কি! মরুক্ গে, একটা পয়সার জন্ম আর অত করে শাপ্ গাল দিসনে বাছা! যা হবার হয়েছে, তার আর কি হবে।"

"না আমি আর কিছু বলতেছিনি, কাশী স্থানে একটু ভয় হোলনি গা! এর বিচের সেই বিশ্বনাথ করবেন। (বিচার কালে বোধ হয় বিশ্বনাথ এরূপ প্রমাণও পাইতে পারেন যাহার দ্বারা তিনি সেই পয়সাটীর জন্য সেই ঝি-কেই দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন।) ছোট বৌঠান! তোমার সই তার শাশুড়ীর সঙ্গে গঙ্গা নাইতে এসেছেল, পথে দেখা হ'ল, তোমাদের সব জিজ্ঞেসা কর্‌লে, আমি বন্নু সব ভাল।"

ছোট বৌ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বড় বৌ ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "তোর ছোট বৌঠান ত আমাবস্যেতে প্রাগে ত্রিবেণী নাইতে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁগা সত্তি নাকি? ওগো ছোট বৌঠান, আমাকেও সঙ্গে নিও গো, তোমাদের আশীর্ব্বাদে একবার পেরাগটা হ'য়ে গেলে বাঁচি।"

ঝি কথাগুল বড়ই উচ্ছ্বাস সহকারে বলিয়াছিল, সেজন্য ছোট বৌ তাহার উপর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আ মরণ পোড়ার মুখি! অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন্ লা?"

"না গো, আমি আর চেঁচাবনি। তোমার পায় গড় করি ছোট বৌঠান! তোমার স্বামী পুত্তুরের কল্লেনে একবার ত্রিবেণীতে ডুব দে মাতাটা মুড়িয়ে আসব।"

"তা এখনি ত আর কেউ যাচ্ছে না, তুই এখন নিজের কাজে যা।"

ছোট বৌ ঝিকে নিজ কাজে যাইতে বলিলেন বটে, কিন্তু নিজের মনটীকে কোন কাজেই স্থির ভাবে নিযুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। কাল তিনি নারদ ঘাটে তাঁহার পিসীমার বাড়ী গিয়াছিলেন। সেখানে শুনিয়া আসিয়াছেন, যে তাঁহারা সকলেই অমাবস্যার সময় প্রয়াগে যাইবেন। বিশেষতঃ উঁহার পিসীমার কন্যা ক্ষান্তদিদি এবং বৌদিদিও যাইবেন শুনিয়া অবধি ছোট বৌ প্রয়াগ যাইবার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। বাড়ীর লোকেরা যে ছোট বৌকে যাইতে দিবেন, এরূপ আশা খুব কম, কোলের খোকাটীরও বয়স মাত্র দেড় বৎসর।

ছোট বৌ এই সাত পাঁচ ভাবিয়া বড়ই আকুল হইলেন। ছোট বৌ না হয় ছ বৎসর পরেও যাইতে পারিতেন, কিন্তু পোড়া কুম্ভমেলা যে বার বছরের কমে হয় না!

২

অমাবস্যার আর বেশী দিন নাই। দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল, ছোট বৌয়ের প্রয়াগে যাইবার বাসনাও তত বলবতী হইতে লাগিল। তিনি এতদিন একথা শাশুড়ীর কাছে বলিতে পারেন নাই, কিন্তু আর ত না বলিলে চলিবে না, কাজেই আহারাদির পর গৃহিণী যখন রৌদ্র পোহাইতে বসিলেন, ছোট বৌ তেলের বাটী লইয়া শাশুড়ীর কাছে গিয়া বলিলেন, "মা! তোমার পা টা এবার বড় ফেটেছে, তুমি আর অত ভোরবেলা উঠো না। এখন কি পা'য় একটু তেল মাখিয়ে দেব মা?"

গৃহিণী ভাবিলেন, আমার বৌমার এত ভক্তি কেন গজাইল। অন্য দিন ত ডাকিলে পরে একটা না একটা ছুতানাতা করে চলে যা। আজ যদি নিজের ইচ্ছায় এসেছে ত দিক্। প্রকাশ্যে বলিলেন "দাও মা! তোমাদের সাবকাশ থাকে না বলেই বলিতে পারিনে।" ছোট বৌ সবে মাত্র শাশুড়ীর পদে হস্তার্পণ করিয়াছেন, এমন সময় খোকা কাঁদিয়া উঠিল। শাশুড়ী বলিলেন, "যাও মা! নীলুকে শান্ত করগে।" ছোট বৌ বড় বৌয়ের কন্যা হরিদাসীকে নীলুকে দেখিতে বলিয়া স্বকার্য্যে মন নিবিষ্ট করিলেন। "মাঘ মাসের আর ক'টা দিন আছে, এবারে বড় শীত পড়েছে, রোদটা মূলে গায় লাগে না," ইত্যাদি কথা ফেলিয়া ছোট বৌ বলিলেন, "হাঁমা! তুমি কুম্ভের মেলায় কখন প্রয়াগে গিয়েছিলে কি?"

"না বাছা! তোমার শ্বশুর যে মনিষ্যি, তিনি আবার আমাকে কুম্ভের মেলায় নে যাবেন! একবার বড় কাঁদা কাটা করে ঠাকুরুণের সঙ্গে মাঘ মাসে গেছিলুম।"

"এবারে বাবাকে বল না মা! আমাদের সকলকে নে যাবেন।"

"তাঁর মত হ'লেই বা কি হ'বে, তিনি এই শীতে হিমে হাঁপানী নে সঙ্গে যাবেন না। বরদা ছুটি পাবে না, সারদা ত ইংরাজী লেখা পড়া করে একেবারে যেন নাস্তিক খৃষ্টান হ'য়েছে, সে শুনলে পরে তেড়ে মারতে আসবে এখন।"

ইতিমধ্যে তর্কভূষণ মহাশয় জ্যেষ্ঠ পৌত্রের হস্তধারণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন ও হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ ত আমার বৌমারা কত সেবা করেন, তবু তুমি বল কিনা আমার গায় পায় কেউ হাত দেয় না!" গৃহিণী মস্তকাবরণটা টানিয়া বলিলেন, "তোমার ছোট বৌমা যে আমাবস্যায় প্রাগে যেতে বলছে।"

"প্রয়াগে! কুম্ভ মেলায়!—না, সে স্থানে স্ত্রীলোকের যাওয়া উচিত নয়, বড় ভীড় হবে।"

ছোট বৌ শ্বশুর মহাশয়ের কথা শুনিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া শীঘ্রই কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেদিন রবিবার ছিল, সারদা শুইয়া একখানি ইংরাজী পুস্তক পড়িতেছিলেন, ছোট বৌ স্বামী সকাশে পিসীমার সহিত প্রয়াগ যাইবার আব্দার আরম্ভ করিলেন। সারদা আজ কয়দিন যাবৎ ওই কথা শুনিয়া আসিতেছেন, এখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যেতে ইচ্ছা হয়, চলে যাও, ব'কে ব'কে আমার মাথা খেও না। তোমার মাথায় কুম্ভকর্ণ চাপিয়াছে, যাও শীতে, হিমে ছেলেটাকে মেরে ফেল।"

"সে ছেলে ত বাড়ীতেই মরেছিল। তাকে ত আমি কোথাও নে যাইনি। যার মরণ আসবে তাকে কি কেউ ধ'রে রাখতে পারে?"

যাহা হউক, অনেক বলিয়া কহিয়া কাঁদিয়া শাশুড়ীর মন আর্দ্র করিয়া পরিশেষে ছোট বৌ পিসীমাদের সহিত প্রয়াগে যাইবার অনুমতি লাভ করিলেন। শাশুড়ীর যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয় এক ধমক দিলেন,—"এই ত আর বছর বাতে একেবারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছিলে। এখনও উঠিতে বসিতে মা বাপ এবং চৌদ্দ পুরুষকে ডাকিতে থাক, ও কথা আবার কোন মুখে বলিতেছ। ছোট বৌমাকে ও যাইতে দিতাম না, তবে কিনা ছেলে মানুষ, না যেতে দিলে ওর মনে কষ্ট হইবে, আর ওর পিসীরা সকলেই যাচ্ছেন তাই যাইতে দিতেছি স্ত্রীলোকের ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি থাকা ভাল। কিন্তু নীলুকে লইয়া যাওয়াটা যুক্তি সঙ্গত বোধ হইতেছে না।" গৃহিণী

প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "ওমা সে কি গো! কোলের ছেলে, মা ছেড়ে থাকবে কি করে? আর প্রথমটী নষ্ট হ'য়ে গেছে, কার মুখে শুনেছে যে সাধু সন্নিসীদের পায়ের ধূলোয় শোয়ালে, গায়ে মাখালে আর কোন ভয় থাকবে না, তাই যাবার জন্যে আরো খেপেছে।"

যাইবার অনুমতি পাইয়া পর্য্যন্ত ছোট বৌ বড় আনন্দিত চিত্তে জিনিষপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিলেন। নূতন বাসন, নূতন কাপড় ইত্যাদি লইলেন, তিনি আজ কাল এমন ব্যস্ত, যে সময় মত স্নানাহার হয় না, নীলু সময় মত দুধ খাইতে পায় না। যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিবসে উঁহার পিসতুত ভাই কাশীনাথ আসিলেন। বড় বৌ বলিলেন, "ভাই তুমি ত চল্লে, আমাদের পোড়া কপালে কিছুই হ'ল না, যাও ভালয় ভালয় ফিরে এস।" গৃহিণী নীলুকে কোলে লইয়া কাশীনাথকে বলিলেন, "দেখ বাবা! আমার নীলরতনের যেন কোন কষ্ট হয় না; আমি তোমার ভরসায় এদের যেতে দিচ্ছি। এদের সব ভার তোমার ওপর রইল।"

কাশীনাথ উত্তর করিলেন, "মা! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাদের বাড়ীর সকলেই যাচ্ছেন। কোন ভয় নাই, আপনাদের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে কোন কষ্ট হইবে না।"

ছোট বৌ সকলকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে পাল্কীতে উঠিলেন। গৃহিণী একবার সারদার খোঁজ করিলেন, কিন্তু তিনি বাড়ী ছিলেন না। সাশ্রুনেত্রে তিনি নীলুকে ছোট বৌর কোলে তুলিয়া দিলেন। নীলু জন্ম গ্রহণ করিয়া অবধি পিতামহীর কাছেই আছে। আজ সে উঁহাকে ছাড়িয়া চ'লল। ছোট বৌ চলিয়া গেলেন, ঝি পড়িয়া রহিল।

৩

কাশীধামের দুইটী রেলওয়ে ষ্টেশন, একটী বেনারস সিটী বা রাজঘাট, অপরটী বেনারস কেন্টনমেণ্ট বা সিক্রোল। রাজঘাটে তীর্থভ্রমণকারী যাত্রীবর্গের বড় জনতা হয় বলিয়া ভদ্র লোকেরা প্রায় সিক্রোলেই আসিয়া থাকেন। কাশীনাথও মাতা, স্ত্রী এবং ভগ্নিদ্বয়কে লইয়া সিক্রোলেই আসিয়াছেন, আজ কিন্তু দুটী ষ্টেশনই সমান জনাকীর্ণ; যে দিকে দৃষ্টিপাত কর কেবল নরশিরই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। যদিও সকলেই নিজ নিজ স্বাভাবিক স্বরেই কথা কহিতেছিল, তবু সকলের কণ্ঠস্বরের সমষ্টিতে কর্ণবিদারী এক তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছিল। সকলেই গাড়ীর আগমন প্রতীক্ষায় উৎসুক, সকলেরই অগ্রে স্থান লাভ করিবার সমান আগ্রহ। দেখিতে দেখিতে ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে নিজ বিশাল বপু লইয়া ট্রেণ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন মাত্রেই চারিদিকে হুড়াহুড়ি, তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। ভাগ্যগুণে কাশীনাথ শীঘ্রই একখানি লোকশূন্য কম্পার্টমেন্ট পাইলেন। সকলকে গাড়ীতে তুলিয়া নিজে নীলুকে কোলে লইয়া প্লেটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় সারদা ব্যস্ততা সহকারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাশীনাথ কারণ জিজ্ঞাসু হইলে বলিলেন, "কাল যখন ইহারা আসে, আমি তখন বাড়ী ছিলাম না। রাত্রে খোকার জন্য বড় কষ্ট হইতে লাগিল, সেই জন্য মনে করিলাম একবার দেখিয়া আসি।" কাশীনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তার পর?"

"তার পর আর কিছু নহে, খোকাকে দেখিতে আসিয়াছি আর কি!"

নীলু পিতাকে পাইয়া বড়ই খুসী হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পিতাও যেন হারানিধি পাইলেন, পুত্রকে কণ্ঠালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সারদা একবার ছোট বৌর পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত কাশীনাথকে বলিলেন, "লগেজ সব তোলা হইয়াছে কি?"

"আমাদের পাঁড়েজীর অনুগ্রহে সে সকল আমাদের দেখিতে হইবে না," বলিয়া কাশীনাথ এক বার সহাস্যে পাঁড়েজীর প্রতি চাহিলেন, পাঁড়েজীও অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কুছ মুজাকা নহী। বাবা বেণীমাধো সব ভাল করিবে।" ট্রেণ ছাড়িবার আর বেশী দেরী নাই, এমন সময় একদল যাত্রী সেই গাড়ীতে উঠিতে আসিল। তাহাদের মধ্যে যে অগ্রবর্ত্তী ছিল, পাঁড়েজী তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া বলিলেন, "এহাঁ নহী"

দূসরে গাড়ীমে যাও।” সময়াভাবে সে বেচারি ফিরিয়া চাহিতেও পারিল না।

এই বারে কাশীনাথ নীলুকে লইয়া গাড়ীতে উঠিবেন মনে করিলেন, কিন্তু নীলু কিছুতেই পিতাকে ছাড়িতে চাহিল না। সে কেবল বলিতেছিল, “বাবা থাকুলমাল কাছে চল।” কাশীনাথ সারদাকে বলিলেন, “ভাই! তোমাকে আসতে দেখে মনে হইতেছিল, যে কেহ পলাতক আসামীকে গ্রেফ্‌তার করিতে আসিতেছে, যা'হোক একটা গোল বাধাইয়াই তুলিলে দেখছি।”

“তাহা না হইবে কেন, যে যেমন কাজ করে তাহার মনে তেমনই আশঙ্কা উপস্থিত হয়।” এই বলিয়া সারদা বলপূর্ব্বক নীলুকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। পিতাপুত্রে উভয়ে উভয়ের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন, গর্ব্বিত ট্রেণ কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া নিজ গতি সতেজ করিয়া দিল। আমাদের ছোট বৌ আনন্দিত চিত্তে নীলুকে লইয়া ভাল হইয়া বসিলেন। ক্ষান্ত দিদিকে বলিলেন, “দেখ দিদি! আমার শাশুড়ীর আর জা'র একটু ধর্ম্মে মতি নেই। এই ত এলেই হ'ত! আমাকে যে কত রকম ভয় দেখিয়েছিলেন, রেলে উঠতে পারবে না, উঠলেও বসবার ঠাঁই পাবে না।”

“বাবা, খুব লোক যা হোক।” বলিয়া দিদি ঠাকুরাণী ছোট বৌর বাক্যের পোষকতা করিলেন। যতক্ষণ ছোট বৌ গাড়ীতে উঠেন নাই, ততক্ষণ কেবল যাইবার কথাই ভাবিতেছিলেন, এখন এক এক বার ইহাও মনে হইতে লাগিল, যে কেনই বা নিজের জেদের উপর এই কাজ করিলাম। সকলের মতামত উপেক্ষা করিয়া নিজ ইচ্ছায় কোন কার্য্য করিলে প্রায় সকলেই এই মত শেষে ভাবিয়া থাকেন। নীলুর জন্যই তাঁহার বিশেষ চিন্তা হইতেছিল, কিন্তু এখন ত উপায়ান্তর নাই।

৪

আজ অমাবস্যা, আজ আর ত্রিবেণীতটের সেই বিস্তীর্ণ বালুকারাশি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বোধ হইতে ছিল, প্রত্যেক বালুকাকণা আজ নররূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। তটোপরি শত শত বিপণি, ক্রেতা বিক্রেতার কলরবে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইয়াছে। এক পার্শ্বে কল্পবাসকারীদের কুটীরগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। সে গুলি দেখিলে বোধ হয়, যে ভারতবাসীদের অবস্থা ক্রমে ঐরূপ কুটীরে বাসোপযোগী হইয়া আসিতেছে, উহা তাহারই নিদর্শন স্বরূপ। প্রয়াগ-তীর্থ তীর্থরাজ নামে অভিহিত। কথিত আছে, বিমাতাপীড়নে ভার্য্যা ও অনুজসহ ভগবান রামচন্দ্র যখন বনযাত্রা করেন, সেই কালে, তাঁহার মুনিগণ-সেবিত চরণদ্বয় সর্ব্ব প্রথমে এই তীর্থে পতিত হয়, সেই জন্য আর্য্যসন্তানেরা ইঁহাকে তীর্থরাজ পদবী দিয়াছেন। ভারতে যত প্রকার সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে প্রয়াগে একত্রিত হইয়াছেন। ধন্য হিন্দুজাতি, তোমার ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে ধন্য। যে সময় লোকে শয্যা হইতে উঠিতে বা লেপের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিতেও সাহস করে না, সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে তুষারশীতল জলে হিন্দুগণ অকাতরে অম্লান বদনে অবগাহন করিতেছেন। ধনী দরিদ্র সকলেরই এক লক্ষ্য, আজ ইঁহাদের মধ্যে কোন ভেদভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, এই ভগ্নীত্রয় যে স্থানে মিলিতা হইয়া ভগ্নীসম্মিলনজনিত আনন্দে উচ্ছ্বাস করিতেছেন, আজ সকলেই সেই পূত সলিলে, সেই পুণ্য-স্থানে স্নান করিয়া সমান আনন্দলাভ ও অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন। ইংরাজগণ সহধর্ম্মিণীসহ নৌকা-রোহণে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া বেড়াইতেছেন।

এই বিশাল জনতার মধ্যে ছোট বৌ নীলুকে লইয়া পিসীমা, দিদি, বৌদিদির সহিত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, কাশীনাথ ও পাঁড়েজী তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। সে সময় সাধুরা স্নান করিতে যাইতেছেন বলিয়া পুলিশের লোকেরা সাধারণ স্নানার্থীদিগকে আটক করিয়া রাখিয়াছে। সন্ন্যাসীদের এক একটী দলের বা আখড়ার অশ্ব, হস্তী, ডঙ্কা, নিশান, স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত আসবাব সকল দেখিয়া নয়ন ঝলসিত হইয়া যাইতেছে। কাশীনাথ যে স্থানে দাণ্ডায়মান ছিলেন, পূর্ব্বে সে স্থানে ভীড় কিছু কম ছিল, ক্রমে সেস্থানও লোকে ভরিয়া গেল, ভীড়

দেখিয়া তিনি নীলুকে নিজের কোলে লইলেন। নীলুও কান্না জুড়িয়া দিল। ছোট বৌ ভ্রাতাকে বলিলেন, "দাদা, নীলু এখনো কিছু খায়নি, ওকে কিছু খাবার কিনে দাও।" এমন সময় সন্ন্যাসীদের আখড়ার একটা প্রকাণ্ড হস্তী ক্ষেপিয়া উঠায় বড়ই গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। সেই হুড়াহুড়িতে কাশীনাথের মাতা ভূপতিতা হইয়া হাঁটুতে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। কাশীনাথ নীলুকে তাহার মাতার কোলে দিয়া জননীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুলিশকর্ম্মচারীগণ অতি কষ্টে সেই প্রমত্ত বারণকে স্থানান্তরিত করিয়া স্নানার্থীদিগের পথ মুক্ত করিয়া দিল। এই বারে যেন মনুষ্যরূপী মহাসাগরে ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইল। সকলেরই ইচ্ছা, যে সর্ব্বাগ্রে স্নান করিয়া সমস্ত পুণ্য টুকু কুড়াইয়া লইবেন। সে জনতা শেষ হওয়াও অসম্ভব, কেহ একটু পরে স্নান করিবার ইচ্ছা করিলেও পারিতেছেন না, ভীড়ের মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে যাইতে হইতেছে। এখন আর কেহ নিজ ইচ্ছানুসারে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিতেছে না। সে জনতা ভেদ করে কাহার সাধ্য? পশ্চাৎদিক হইতে এক প্রবল জনতরঙ্গ আসিয়া অগ্রবর্ত্তীদিগের উপর পড়িল, সে সময় কে কোথায় গেল তাহার কিছু স্থিরতা রহিল না, সে সময় ছোট বৌ নীলুকে সামলাইতে না পারায় সে কোল হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেল। সে সময় ছোট বৌয়ের অবস্থা কি শোচনীয়! আপনাকে রক্ষা করিবার শক্তি নাই, তথাপি প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত। আলু থালু বেশে "দাদা দাদা" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। মস্তকে করাঘাত করিয়া সমীপস্থ লোকদিগকে বিনয় পূর্ব্বক পুত্রকে তুলিতে বলিতেছেন; কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। সঙ্গীগণ সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন। এখন কে তাহার কথা শুনিবে? কে তাহার সাহায্য করিবে? সে স্থানে নড়িবার শক্তি বা স্থান নাই, ভূমি হইতে কিছু উত্তোলন করা ত দূরের কথা। একবার নিম্নগতি হইলে বড় বড় বলবান পুরুষের সাধ্য নাই যে উঠিয়া দাঁড়ায়। মুহূর্ত্ত মধ্যে কত লোক তাহার পৃষ্ঠ ও মস্তকের উপর দিয়া যাইবে। অগত্যা ছোট বৌ যখন নিজেই নীলুকে তুলিতে গেলেন তখন তাঁহারও উক্ত দশা হইল। কঠিন লৌহ-নির্ম্মিত লেখনীর সাধ্য নাই, যে সে হৃদয়বিদারী করুণোৎপাদক ঘটনার বর্ণনা করে। পাঠক পাঠিকাগণ নিজেই তাহা অনুভব করুন।

কাশীনাথ বাবু যদিও অক্ষত শরীরে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দুর্দ্দশাও কম নহে। সমস্ত দিন অস্নাত, অনাহারে সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলেন। বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় এক স্থানে নিজ স্ত্রী ও ভগ্নী ক্ষান্তকে দেখিতে পাইলেন। ক্ষান্তর গলার দড়ী-হার কোথায় ছিঁড়িয়া পড়িয়া গিয়াছে। উহাঁর স্ত্রীর নাক কাটিয়া নথ পড়িয়া গিয়াছে, সমস্ত বস্ত্রাদি রক্তাক্ত। ইঁহাদের ত এই দশা, ওদিকে কাশীনাথের মাতা আহত শরীরে কুটীরে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন। যাহা হউক, কোন রূপে সকলের সন্ধান মিলিল, কিন্তু ছোট বৌ কোথায়? কাশীনাথ তাঁহার জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাকুলিত ছি[illegible] তিনি কেবলি ভাবিতে লাগিলেন, সারদা ও তাঁহার বাড়ীর লোকেরা একথা শুনিলে কি বলিবেন? যদি ছোট বৌয়ের কোন সন্ধান না পাই, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কি [illegible] মুখ দেখাইব, কি বলিব। যখন উহারা জিজ্ঞাসা করিবেন, যে ছোট বৌ আর নীলু কোথায়, তখন তাহাদিগকে কি উত্তর দিব? কাশীনাথ আরও ভাবিলেন, যে তাঁহারা মনে করিবেন, পর মনে করিয়া কেহ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে নাই, বা ভাল রূপে অনুসন্ধান করে নাই। কাশীনাথ একেবারে দিশেহারা হইয়া কাতর-কণ্ঠে বলিলেন, "হে ঈশ্বর! কোন্ পাপে আমার উপর এ কলঙ্ককালিমা লেপন করিলে! হায়! আমার মৃত্যু হইল না কেন? আমি কেন স্ত্রীলোকদের পরামর্শে সঙ্গে আসিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম?"

কাশীনাথ এক এক স্থান দশ বার করিয়া পাগলের মত খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। কখন ত্রিবেণীতটে, কখন কল্পবাসীদিগের কুটীরাভ্যন্তরে, কখন যে স্থানে মৃতদেহ স্তূপাকারে রক্ষিত রহিয়াছে সে স্থলে, কখন পুলিশের লোকদের জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। অনেক

১০৪ (ক)



রবিবর্ম্মা।

অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন, ছোট বৌকে আহত লোকদের সহিত হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছে। কাশীনাথ তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ছোট বৌকে একটা খাটে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। বক্ষঃস্থলে বিষম আঘাত লাগিয়াছে, অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভ্রাতাকে দেখিবা মাত্র হতভাগিনী সেই ভাঙ্গা বুক দুই হস্তে চাপড়াইয়া, "নীলুরে নীলুরে" করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। "দাদা গো! তুমি আমার নীলুধনকে এনে দাও। আহা! বাছা আমার এখনো কিছু খায় নাই। তুমি শিগগীর তাকে নে এস, আমি তাকে দুধ খাওয়াব। এখন অন্ধকার হয়ে এল, বাছা আমার কার কাছে শোবে। আমি কোন্ মুখ নে কাশী যাব? মা যখন আমার কাছ হ'তে নীলুকে নিতে আসবেন, তখন আমি কি বল্‌ব? দাদা, তুমি এক বার গে খোঁজ, সে হয়ত কোন খানে পড়ে' আছে, তুমি তুলে আন।"

হায় হতভাগিনী ছোট বৌ, তোমার নীলুধনের এ পৃথিবীতে আর কোন চিহ্নই নাই। তার নবনীবৎ কোমল শরীর খানি যে লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের পদতলে পড়িয়া ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। হায়, এই পুত্রশোকাতুরা জননীর মর্ম্মভেদী বিলাপ লিখিয়া জানাইবার বস্তু নহে। কাঁদিতে কাঁদিতে ছোট বৌয়ের রক্ত বমন হইতে লাগিল। ক্ষণ পরেই ছোট বৌ অচেতন হইয়া পড়িলেন।

পর দিবস টেলিগ্রাম পাইয়া সারদা প্রয়াগে আসিলেন। প্রথমে তিনি এই হৃদয়বিদারক ঘটনা শ্রবণে অজস্র অশ্রুপাত করিলেন। ছোট বৌ তাঁহাকে দেখিয়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখ ঢাকিয়া খুব কাঁদিলেন। কিন্তু ক্ষণ পরে সারদা কাশীনাথকে বলিলেন, "পুণ্য কার্য্যের ফল্ল ত হাতে হাতেই পাওয়া গেল, এখন ইহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।" ছোট বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি গুরুজনের বাক্য অবহেলা করিয়া যেমন আসিয়াছিলাম, আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভাল করেই হইয়াছে, আর আমি বাড়ী যাব না, আমি আমার নীলুধনের কাছেই এখন যাব।"

ভগবান বুঝি হতভাগিনীর কথায় কর্ণপাত করিলেন। ছোট বৌ অচিরে তাঁহার নীলরতনের কাছে চলিয়া গেলেন।*

প্রবাসিনী।

---

# রবিবর্ম্মা।

ভারতের সুদূর সীমান্তবর্ত্তী দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরে সেদিন এক জন মহাশক্তিশালী, অপূর্ব্ব প্রতিভাবান্ পুরুষ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশার্থ, তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য, আজ পর্য্যন্ত কোন সভাসমিতির কথা কোথাও শুনি নাই, অথবা সংবাদ পত্রেও পড়ি নাই। কিন্তু এই বিশাল ভারতের সমগ্র মানব-মণ্ডলীর অন্তরে তিনি যে এক রুদ্ধপ্রায় স্রোতের উৎস খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, যুগ যুগ ধরিয়া চিরকাল তাহা প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইয়া ভারতবাসীর অন্তরকে অনুরঞ্জিত ও আনন্দরসে অভিষিক্ত করিবে। ইঁহার নাম রাজা রবিবর্ম্মা।

উপনিষদের যুগে ভারতের জাতীয় জীবনে যখন তেজ ছিল, উৎসাহ ছিল, তখন ঋষি ভগবানের আনন্দময় স্বরূপ হৃদয়পটে অবলোকন করিয়া গাহিলেন, "রসো বৈ সঃ"—তিনি রসময়, আনন্দের নিলয়। তখন সুপুষ্ট সতেজ হৃদয়বৃত্তি দ্বারা ভারত-সন্তান এই জগতের—প্রকৃতির—অনুপম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন, জীবন তাঁহাদের নিকট আনন্দময় ছিল। ভেকের যে আনন্দধ্বনি, তাহা শুনিয়াও তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিত, বৈদিক শ্লোকে এরূপ প্রমাণ আছে।

কিন্তু শোভাসুখ পূর্ণ এই বিশ্বের আনন্দ ও শোভার দিক হইতে ভারতসন্তান ক্রমে তাঁহাদের দৃষ্টি ফিরাইলেন। এ সংসার দুঃখপূর্ণ, এ সংসার অনিত্য, সংসারের বিড়ম্বনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিত্যের পশ্চাতে ধাবিত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য, এই আদর্শই দেশে ক্রমে প্রবল হইল। বিরাগের ধর্ম্ম, যোগের ধর্ম্ম, কৃচ্ছ্রসাধনের ধর্ম্মই

---

* ঘটনাটী একেবারে অমূলক নহে।

এদেশে প্রাধান্য লাভ করিল। যোগী-সন্ন্যাসীরাই এ ধর্ম্মের সেবক হইলেন বটে, কিন্তু আদর্শটা সমস্ত জাতীয় জীবনেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সৌন্দর্য্যবোধের আকাঙ্ক্ষা যখন বর্জ্জনীয় বলিয়া স্থির হইল, তখন চিত্রকলা—সৌন্দর্য্যবোধই যাহার জনক—তাহাও এদেশে আর পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিল না।

এই যে কৃচ্ছ্র ও বৈরাগ্যের আদর্শ, ইহাতে ভারতের মঙ্গল ও অমঙ্গল দুই-ই করিয়াছে। ভারতের আধ্যাত্মিকতা জগৎপূজ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এই জড় জগতের সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে ভগবানের আনন্দস্বরূপ যে পরম উপভোগ্য, গৃহসংসারের সুখ শান্তিতে তাঁহার প্রেম যে দ্রষ্টব্য, হিন্দুধর্ম্মে এ শিক্ষার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। এই জন্যই এদেশে চিত্রকলার বা স্থাপত্যবিদ্যার উন্নতি হয় নাই।

প্রকৃতির যে বিচিত্র সৌন্দর্য্য, বর্ণতুলিকাযোগে তাহা চিত্রিত করিয়া লাভ কি? তাহাতে ত মুক্তির পথ নিকট হইবে না? মানুষের যে সুন্দর মুখ, অবস্থা বিশেষে প্রীতি, শান্তি, ক্রোধ প্রভৃতি মনোবৃত্তি বিশেষের প্রাবল্যে তাহাতে যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহা চিত্র করিতে সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? তাহাতে ত পরমার্থ লাভ হইবে না, বরং অনিত্য পদার্থে আসক্তিই প্রকাশ পাইবে। সুতরাং হিন্দু চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর-বিদ্যার অনুরাগী কোন দিনই হয় নাই। এই উভয় বিদ্যার এক মাত্র প্রয়োজন ছিল দেবমূর্ত্তি গঠনে ও চিত্রনে এবং দেব-মন্দির নির্ম্মাণে। কিন্তু দেবতা অতি-প্রাকৃত, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহাদের সাদৃশ্য না থাকাই যুক্তিসঙ্গত। মানুষের একটী মাত্র মাথা, দেবতা ত মানুষ নহেন, তাঁহাদের কাহারও পঞ্চ মুখ, কেহ বা ষড়ানন; মানুষের দুইটি মাত্র চক্ষু, দেবতাদের ত্রিনয়ন, কেহ বা সহস্রনয়ন। এই প্রকার হস্ত পদাদি কোন বিষয়েই মানুষের সহিত—দৃশ্যমান প্রকৃতির সহিত, তাঁহাদের সাদৃশ্য নাই। সুতরাং চিত্র ও ভাস্কর্য্য বিদ্যা অল্প দূর গিয়াই আর অগ্রসর হইতে পারিল না। উদ্ভট বিষয়ে চিন্তা মানুষ বেশীক্ষণ করিতে পারে না, তাহার পশ্চাতে শক্তি নিয়োগ করিলেও সেই শক্তি সুফল প্রসব করে না। এই জন্য হিন্দু তাঁহার দেবমূর্ত্তি বা দেবমন্দির গঠনে বা চিত্রনে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে যেন প্রাণ নাই, সকলই শুষ্ক ও নীরস।

এদেশে চিত্রকলার এই প্রাণহীনতা দূর করিয়া চিত্রসৌন্দর্য্যে প্রাণ ও সজীবতা সঞ্চারের প্রথম পুরোহিত রবিবর্ম্মা। পাশ্চাত্য মনোরম চিত্রকলার মোহন সৌন্দর্য্য এদেশবাসীর গৃহদ্বারে সবেগে ঘন ঘন আঘাত করিতেছিল, কিন্তু তাহার বৈদেশিক বেশ ভূষা দেখিয়া হিন্দু তাহার অভ্যর্থনা করে নাই। পাশ্চাত্য শিল্পের সেই আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া রবিবর্ম্মা ভারতের দীনা, কৃশা চিত্র-দেবতার প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন। স্বভাব-সুন্দর, প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ত্রিবাঙ্কুর তাঁহার জন্মভূমি, সেই স্বভাবসৌন্দর্য্যের সংস্পর্শে তাঁহার কোমল বৃত্তি নিচয় সুপুষ্ট; সেই সবল হৃদয়বৃত্তি দিয়া সেই ক্লিষ্ট চিত্রদেবতাকে তিনি সাদরে বরণ করিয়া লইলেন। ভারতের প্রকৃতিতে ও সৌন্দর্য্যললামভূতা ভারতনারীর দেহগৌরবে যে কোমলতা ও সৌন্দর্য্য আছে তদ্দ্বারা হিন্দুর শাস্ত্র, পুরাণ ও সাহিত্যে চিত্রশিল্পের যে সকল বিষয় ছিল, তিনি তাহাই সজীব করিয়া তুলিলেন। রবিবর্ম্মার অঙ্কিত এই সকল পৌরাণিক চিত্র এখন ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত। প্রাণহীন চিত্রের পরিবর্ত্তে ঘরে ঘরে এখন রবিবর্ম্মার মনোরম চিত্রাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়, হৃদয় তৃপ্ত হয়। স্বভাবকে অনুসরণ করিয়া এই যে চিত্তহারী চিত্রাঙ্কন-প্রথা রবিবর্ম্মা এদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহার ফল অতি দূরপ্রসারী, আমাদের জাতীয় জীবনে ইহার প্রভাব ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইয়া অতি উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিবে। বিধাতার মোহন বিশ্বে যাহা সুন্দর ও মনোরম আমাদের এবং ভবিষ্যদ্বংশের অন্তরে তাহা সম্ভোগ করিবার শক্তি বর্দ্ধিত করিবে। উদ্ভট, অস্বাভাবিক কল্পনার পরিবর্ত্তে আমাদের চিত্তকে স্বভাবের অনুগামী করিতে সাহায্য করিবে। মরণশীল মানুষের ভাগ্যে জাতীয় চরিত্রে এরূপ অমর প্রভাব বিস্তার করিবার দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুরের অন্তঃপাতী কালিমান্নুর গ্রামে উচ্চ ক্ষত্রিয়কুলে রবিবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিবাঙ্কুরের রাজবংশের সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এই জন্য ইঁহারাও রাজা নামে আখ্যাত। রবিবর্ম্মার জননীর নাম উমা অম্বা বাই। তিনি সুশিক্ষিতা ও সুমার্জ্জিতা নারী ছিলেন। কবিত্ব-শক্তির জন্য তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ও একটী কন্যা। রবিবর্ম্মাই সকলের জ্যেষ্ঠ। ভারতের পশ্চিমোপকূলে মালাবার প্রভৃতি দেশে নারীগণেরই প্রাধান্য, ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী নারী, পুরুষগণ তাঁহাদের পোষ্য মাত্র! এই জন্যই রবিবর্ম্মার জননীর পরিচয় আমরা অবগত হইলেও তাঁহার পিতার সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি; সেই "অনাচারের দেশে" * সন্তানগণের পিতা যে কে, সমাজে তাহার পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক নাই, অনেক সময় সন্তানেরাও তাহা জানে না। যাহা হউক, মাতার সুকুমার শক্তির প্রভাব তাঁহার চারি সন্তানেই সংক্রামিত হইয়াছিল। রবিবর্ম্মা বাল্যকালেই পুস্তকাধ্যয়ন অপেক্ষা অঙ্গার ও খড়ির সাহায্যে দেয়ালে ও শ্লেটে দেবদেবীর চিত্র অঙ্কনে অধিক মনোযোগ প্রকাশ করিতেন। আত্মীয় স্বজনগণ অধ্যয়নে বালকের এই অমনোযোগিতা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার মাতুল রাজা রাজাবর্ম্মা চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন, তিনি রবিবর্ম্মার চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সুখী হইলেন। বলা বাহুল্য ঐ নারী-প্রধান দেশে মাতার ভ্রাতা—মাতুলই বালকবালিকাগণের পুরুষ অভিভাবক। সুতরাং মাতুলের উৎসাহে রবিবর্ম্মার কলানুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি স্বহস্তে ভাগিনেয়কে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি মাতুলের সহিত ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম নগরে গমন করেন ও স্বহস্তাঙ্কিত কয়েক খানি চিত্র ত্রিবাঙ্কুর-রাজকে উপহার প্রদান করেন। চিত্রবিদ্যা এখন এদেশে বরং একটু সম্মান লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে সময়ে উহা ভদ্রোচিত কার্য্য বলিয়াই বিবেচিত হইত না। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের তৎকালীন রাজা সুশিক্ষিত লোক ছিলেন, তিনি বালকের প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং রাজানুগ্রহে তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিলেন। এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যে ত্রিবাঙ্কুরের রাজবংশেও নারীর উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত। মহারাজের সন্তানগণের রাজসিংহাসনে উত্তরাধিকার নাই, তাঁহার পত্নী রাণী উপাধি পান না, রাজার ভগিনীই প্রকৃত রাণী; রাজভগিনীর সন্তানই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। এই রাজভগিনীগণের বিবাহ সাধারণতঃ রবিবর্ম্মার বংশীয় পুরুষগণের সহিত হয়। এস্থলে বংশ অর্থ মাতুল ও মাতুলের মাতুল ইত্যাদি। রবিবর্ম্মাও তদানীন্তন রাণীর কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন। উত্তর কালে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারিণীর মৃত্যু হইলে রবিবর্ম্মার দুইটী দৌহিত্রী রাণীপদে পোষ্যা গৃহীত হইয়াছেন।

মাতুলের উৎসাহ ও রাজানুগ্রহের উপর রবিবর্ম্মার চিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্য লাভের আর এক অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে থিওডোর জ্যানসেন নামক জনৈক ইংরেজ চিত্রকর মহারাজার ও রাজ পরিবারস্থ কয়েক জনের চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য মহারাজ কর্ত্তৃক ত্রিবান্দ্রমে আনীত হন। চিত্রকরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহারাজের আদেশে নিকটে বসিয়া রবিবর্ম্মা তাঁহার চিত্রাঙ্কন-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার অনুমতি পাইলেন। ইউরোপীয় প্রণালীতে তৈলচিত্রে বর্ণবিন্যাস প্রথা ও তাহার চমৎকার ফল দেখিয়া রবিবর্ম্মা এই প্রথার অনুসরণ করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে অনভিজ্ঞতা বশতঃ পদে পদে অসুবিধা উপস্থিত হইতে লাগিল। সমগ্র ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সে সময়ে একজন মাত্র তৈলচিত্রকর ছিলেন। তাঁহার নাম রামস্বামী। রবিবর্ম্মা তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে স্বীয় প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি রবিবর্ম্মাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন না। কিন্তু রবিবর্ম্মা স্বীয় অধ্যবসায় গুণে শীঘ্রই প্রতিদ্বন্দিতায় তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। উত্তরোত্তর

* এই সকল শাস্ত্রাচার-বিরুদ্ধ আচার ব্যবহারের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের লোকেরা মালাবারকে "অনাচারের দেশ" বলে।

তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইতে লাগিল। তাঁহার অঙ্কিত নরনারীর প্রতিকৃতি ও পৌরাণিক চিত্রাবলী লোকের নয়ন-মন মুগ্ধ করিতে লাগিল। ভারতের গবর্ণর জেনেরাল হইতে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ, বরোদা-রাজ প্রভৃতি দেশীয় নৃপতিগণ সকলে তাঁহাকে পরম সমাদর করিতে লাগিলেন এবং পরম আগ্রহে তাঁহাদ্বারা চিত্র অঙ্কিত করাইয়া বহুমূল্যে তাহা ক্রয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু রবিবর্ম্মা শুধু তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার চিত্রাবলী বিস্তৃত হইয়া যাহাতে ভারতবাসীর মন সুকুমার শিল্পের প্রতি অনুরাগী হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি একটী লিথোগ্রাফিক প্রেস ক্রয় করিয়া তাঁহার নানা বর্ণে চিত্রিত চিত্রাবলীর রঞ্জিত প্রতিলিপি সুলভ মূল্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। আমরা রবিবর্ম্মার যে সকল চিত্র দেখিতে পাই, তাহা এই লিথোপ্রেসে মুদ্রিত।

রবিবর্ম্মার চিত্রাবলী ভারতের এবং ইউরোপের ও আমেরিকার বহু শিল্প-প্রদর্শনীতে পরম সমাদর লাভ করিয়াছে, অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্য-পদক পুরস্কার লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার চিত্রাবলী যে তাঁহার দেশবাসীর নিকট এত সমাদর লাভ করিয়াছে, ভারতীয় চিত্রশিল্পে তাহা যে যুগান্তরের সূচনা করিয়াছে, ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

---

## প্রেমে সংযম।*

( ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের "ল্যাওডেমিয়া" নামক কবিতার অনুবাদ )

আত্মহারা পতিহীনা ল্যাওডেমিয়া জুড়ি দুই কর,  
কহিছে প্রার্থনা তার অন্তর্য্যামী দেবতা গোচর।  
"স্বর্গের দেবতা ওগো, শুন শুন এ কাতর বাণী,  
পতি সে দেবতা মম, দাও দেব, দাও মোরে আনি।  
অন্ধকার ছায়াপুরী, সেথা হতে এনে দাও তায়,  
দুঃখিনী তাপিতা নারী, তার রত্ন দাও পুনরায়।"

এই কথা সাঙ্গ করি' আত্মহারা অসীম প্রণয়ে,  
পূর্ণ বিশ্বাসের ভরে, জুড়ি কর আছে শূন্যে চেয়ে;  
কাটিয়া মেঘের স্তর সহসা প্রকাশে যথা রবি,  
তেমনি উজল মুখ, চোখে যেন জাগে স্বর্গ-ছবি।  
সহসা কম্পিত হৃদি, যেন সে কত না আশাভরে  
চাহিল, প্রার্থনা তার বুঝি পূর্ণ হল চির তরে।

কি ভীষণ দৃশ্য নেহারিছে? না না আত্মহারা সুখে  
কাহারে হেরিল যেন, চাহিয়া রয়েছে কার মুখে!  
তাহারি দেবতা এযে, ট্রয়-তীরে গেল প্রাণ যার!  
সাক্ষাৎ সম্মুখে সে যে নেহারিছে আনন তাহার।  
একি স্বপ্ন, একি ভুল! একি মিথ্যা, কিম্বা জাগরণ!  
—স্বর্গের দেবতা সাথে করিয়াছে ধরা আগমন?

সহসা স্বর্গের দূত পরশিল মায়া দণ্ড দিয়া,  
দূরে গেল ভয় তার, হল শান্ত অশান্ত সে হিয়া।  
"ল্যাওডেমিয়া, স্বর্গরাজ শুনি তব কাতর আহ্বান,  
তোমার পতিরে আজি তোমা পুনঃ করেছেন দান।  
দয়া করি দেবতারা, শুধু তিন প্রহরের তরে  
দিয়াছেন, সুখী হও উভয়ে নেহারি পরস্পরে।"

অধীর আবেগে রাণী প্রসারিয়া দুই বাহু তার,  
গেল আলিঙ্গন তরে, একি শূন্য শূন্যের মাঝার!  
বাহু পাশে বন্দী ভাবি চায় ফিরে' কিছু নাহি হায়,  
আবার ফিরিয়া আসে, দেখে চেয়ে পতির কায়ায়।  
দেবতা—অস্পর্শ সে যে—অভাগিনী তাহা বুঝিল না,  
দেবাত্মার হৃদে কভু নাহি জাগে ধরার বাসনা।

---

* 'ল্যাওডেমিয়া' সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটী বিখ্যাত কবিতা। "ডেলফি"র দেব-মন্দিরে আদেশবাণী হয়, ট্রোজান যুদ্ধে যে ব্যক্তি বিপক্ষের দেশে সর্ব্বপ্রথমে পদার্পণ করিবে, সে হত হইবে, কিন্তু তাহার আত্মত্যাগে তাহার স্বদেশবাসীগণ জয়যুক্ত হইবে। ল্যাওডেমিয়ার পতি, পত্নীর বিশেষ নিষেধ সত্ত্বেও যুদ্ধে গমন করেন, এবং সর্ব্ব প্রথমে বিপক্ষভূমিতে পদার্পণ করিয়া হত হন। কিন্তু দেবতা পতিপ্রাণা নারীর প্রার্থনায় অল্পক্ষণের জন্য তাঁহার পতির আত্মাকে পত্নী সমীপে প্রেরণ করেন। ল্যাওডেমিয়া অধীর ভাবে আপনার প্রেম প্রকাশ করিলে, তাঁহার স্বামী তাহাকে শান্ত ও সংযত হইবার জন্য উপদেশ দেন, কিন্তু ল্যাওডেমিয়ার অসংযত হৃদয় সেই উপদেশ পালন করিতে সমর্থ হয় নাই। এই অসংযত ভাব বর্জ্জনীয়, ইহাই এই কবিতাটীর শিক্ষা। ভাঃ মঃ সঃ।

"প্রোটিসিলস একি তুমি ? তব সঙ্গী করেছে গমন,
তুমি কি কল্পনা শুধু ? সত্য যদি, কহ গো বচন।
এই যে প্রাসাদ তব, সম্মুখেতে রাজ-সিংহাসন,
তোমার কথায় এক এ ধরণী হবে সচেতন।
দেবতা কি মায়া-জালে, স্বর্গ হতে ভুলালেন মোরে,
তুমি কি কল্পনা শুধু, ছায়া সম ভাসিছ অন্তরে ?"

"ল্যাওডেমিয়া, দেবতা কি ভুলে যান আপন মহিমা,
তাঁর দান পরিপূর্ণ, কোথা আছে বল তাঁর সীমা ?
আমারে ত পাঠালেন, আমি আজ তব পুরস্কার,
তুমি সাধ্বী পতিব্রতা, মুক্ত তাঁর অক্ষয় ভাণ্ডার
মোদের দোঁহার তরে। ছিলাম হেথায় আমি যবে
নির্ভীক, ধর্ম্মের বলে কাজ সাঙ্গ করেছিনু ভবে।

"জান তুমি দৈববাণী শুনেছিল ডেলফিকবাসী,
প্রথমে ট্রোজন তীরে, নামিবে যে গ্রীক সেনা আসি'
হারাবে জীবন তার। আমি তাহে হইনি চঞ্চল,
আপনারে বলি দিয়া, দেশ-মান রাখিনু কেবল।
সর্ব্বাগ্রে ট্রয়েতে গিয়া নামিলাম বালুকা সৈকতে,
আত্মোৎসর্গ করিলাম, প্রাণ দিনু হেক্টরের হাতে।"

"ধন্য তুমি বীর-শ্রেষ্ঠ, হে দেবতা মহান, উদার,
তোমার সাহস ধন্য ; কিছু দুঃখ নাহি তাহে আর।
সকলে হইল ভীত, সে দশ সহস্র সেনাগণ,
কেহ নামিল না তীরে, তুমি করি আত্ম সমর্পণ
রাখিলে দেশের মান। ক্ষমিয়াছি তোমা প্রিয়তম ;
শ্রেষ্ঠতর তব হৃদি, তব কাছে আমি ধূলি সম।

"যদিও সাহসে পূর্ণ, সদা ছিলে বীরত্বে অধীর,
তবু কি দয়ার্দ্র হৃদি, গুণময় বীরশ্রেষ্ঠ বীর !
স্বর্গের দেবতা যিনি, দয়া করে দেছেন পাঠায়ে
মুগ্ধ তিনি তব গুণে। মৃত্যু-দ্বার এসেছ ছাড়ায়ে।
তেমনি ও কেশগুচ্ছ, তেমনি অধর মধুময়,
যখন জীবন ছিল, থেসেলিতে ছিলে প্রেমময় !

"একি শুধু আত্মা তব, একি শুধু ছায়া-বাজী সার,
এস তুমি প্রিয়তম, বস এসে পাশেতে আমার।
এই সেই সুখাসন, দাও আজি একটি চুম্বন,
নব বধূ সম আমি আজি পুনঃ করিনু বরণ।"
সহসা স্বর্গের রাজা করিলেন ভ্রূকুটি প্রকাশ,
সেই ফুল্ল রক্তাধরে, কি কালিমা হইল বিকাশ !

"এই চিহ্ন দেখ রাণী, মোর দিন হয়েছে বিগত,
জেনো সদা এ জগতে ধর্ম্ম নাহি রহে ধর্ম্ম মত
যদি তাহে এনে ফেল জগতের অলস বিলাস ;
অসার কামনা রাশি করে ফেলে শত ধর্ম্ম নাশ।
মোদের সে স্বর্গধাম, প্রশান্ত সে অতি স্থির ধীর
সুখ সে প্রশান্ত অতি, বেদনাও অতল গভীর।

"হে সঙ্গিনী, লও শিক্ষা, দৃঢ় কর ও অধীর মন,
রুদ্ধ কর ও বাসনা। জগদীশ করেন শ্রবণ
গভীর প্রণয় কথা,—নহে কিন্তু অধীরতা তার,
অসীম নিঃস্বার্থ প্রেম,--নহে কিন্তু লেশ কামনার।
ভুলে যাও শোক দুঃখ, ধীর ভাবে করিও বহন
আমার বিরহ-দুঃখ, জান ত্বরা করিব গমন।"—

"কেন যাবে প্রিয়তম, 'হারকুলেশ' মায়া মন্ত্র দিয়া
সজীব করেনি কিগো 'এলেসটিস' সেই মৃত হিয়া ?
তাহার অধীর সেই মধুময় সঙ্গীতের স্রোতে
ভুলায়ে দেবতা হিয়া, মিলন লভেনি দুজনাতে ?
'মেডা' কি বিরহ তীরে, আপনার মায়াময় ডোরে
ভুলায়ে 'ইসনে' আনি, হয় নাই সুখী চিরতরে ?

"দেবতারা দয়াময়, তাঁহারা চাহিলে দয়াভরে,
কি না পূর্ণ প্রিয়তম, বল দেখি সংসার ভিতরে ?
কোন্ মায়া, কোন্ শক্তি, প্রেম সনে হয় গো গণনা ?
কোন্ শক্তি হেন আর, কোথা আছে ইহার তুলনা ?
প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হেথা, যদিও দুঃখেতে পূর্ণ হায়,
রচিয়াছে আসন তাহার দুর্ব্বল অবলা হিয়ায়।

—তুমি গেলে সঙ্গে যাব !" "শান্তি শান্তি" কহে আত্মা ধীরে,
রমণী চাহিল ফিরি তার পানে কি আনন্দভরে !
সে কালিমা চলে গেছে, শোভাময় সহাস আনন,
ফিরিয়ে পেয়েছে যেন পুনঃ সব সৌন্দর্য্য আপন।

স্বর্গীয় মধুর আলো, স্বর্গের সুষমারাশি দিয়া
পরিপূর্ণ। কি প্রশান্ত সুখ-ধারে উছলিত হিয়া!

অতি ধীরে আত্মা তারে কহিতেছে প্রণয় বচন,
পবিত্র বিমল ভাবে, স্বর্গ সুধা করিয়া বর্ষণ!
সে প্রেমে সন্দেহ নাই, ভাঙ্গেনাক মুখের কথায়,
ভবিষ্যত স্থির যাহে, অতীতে ফিরিয়া নাহি চায়।
স্বর্গের মহত্ব কথা, বলিছেন গম্ভীর আননে,
কি বীণা বাজিছে আহা, প্রতি সেই অমিয় বচনে।

সেই স্বর্গ ধামে যেথা সৌন্দর্য্যের নাহি শেষ সীমা,
সুখের আবাসে যেথা বিরাজিছে শান্তির মহিমা।
অসীম গগন-তল, জ্যোতির্ম্ময় কনক কিরণ,
অনন্ত প্রান্তর সেই আলোকিত রয়েছে কেমন।
রবির আবাস যেথা করে' আছে আলো ছায়াময়,
এ ধরণী দেখে নাই, কল্পনায় নাহি কভু হয়।

"ধার্ম্মিক সুধীর যাঁরা, বিসর্জ্জিয়া অসার জীবন,
সেই দিব্য ধামে সুখে করিছেন সদা বিচরণ।
অজ্ঞান অধম আমি বুঝেও বুঝিনি কিছু হায়
ছিনু মত্ত গর্ব্বভরে আপনার অসার খেলায়।
তোমারেও ভুলে ছিনু, ছিনু লয়ে স্বার্থ আপনার
মোর তরে দিবানিশি, ফেলিয়াছ তুমি অশ্রুধার।

"সেই যুদ্ধ ক্ষেত্র মাঝে, সহচর যত ছিল আর,
প্রতিজন দৃঢ় পণ করেছিল হৃদে আপনার।
কারো প্রাণ উল্লসিত সংগ্রামের মত্ত বাসনায়,
শিবির প্রাঙ্গন-তলে কেহ বা আছিল মন্ত্রণায়।
প্রতি সেনা, সেনাপতি, চিন্তাকুল অধীর অন্তরে
'ওলিসেতে' বদ্ধ তরী, প্রতিকূল তরঙ্গের ভরে।

"অনুকূল বায়ু ভরে চলিল তরণী পুনরায়,
সেই শান্ত সিন্ধু-বুকে, দেববাণী মোর বুকে ভায়।
ভাবিলাম মনে মনে, আর কেহ পথ না দেখালে,
মোর তরী প্রথমেতে, উপনীত হবে সেই কূলে।
সর্ব্ব প্রথমেতে আমি যাব সেই ট্রোজনের তীরে,
আমার শোণিত তর্পণ, সান্ত্বনা করিবে দেবতারে।

"ভেবোনাক ভুলেছিনু, একবারো স্মরিনি তোমায়,
সে যাতনা প্রিয়তমে, বুঝাতে কি পারিব ভাষায়?
তোমার অতুল প্রেম, করেছিনু হৃদয়ে স্মরণ,
যে সুখে আছিল পূর্ণ আমাদের দুইটি জীবন।
এই সুখময় গৃহ, এই কুল, লতা, উপবন,
আমার এ প্রিয় দেশ, হয় নাই যাহা সমাপন।

"ভাবিলাম এ সকলি, কিন্তু চিন্তা গেল চলি দূরে,
হাসিবে শত্রুর পক্ষ, চাহিবে মোদের ঘৃণা ভরে।
কাপুরুষ ভীরু আর, মরণে বলিবে এত ভয়?
তখনি দুর্ব্বল মন করিলাম সবলে বিজয়!
আবার কাঁপিল চিত্ত, সহসা স্বর্গীয় ভাব রাশি
দুর্ব্বলতা হতে প্রিয়ে, মুক্ত মোরে করে দিল আসি।

"যদিও তোমার প্রেম, অতুলন, সুগম্ভীর অতি,
কিন্তু নহে আত্মজয়ী, বিচলিত দুরবল মতি।
প্রিয়তমে, স্থির হও, কর দৃঢ় কোমল অন্তর,
হইবে মিলন পুনঃ, পরলোকে সুমধুরতর।
স্বর্গের দেবতা—তিনি তব দুঃখে দুঃখী অতিশয়,
হোক তব প্রেমরাশি স্বার্থহীন, লভিয়া বিজয়।

"আকাঙ্ক্ষা বাসনা ছাড়ি, চাহ প্রিয়ে উচ্চে, উর্দ্ধপানে,
ও বাসনা পূর্ণ হোক্। এই প্রেম—এই পুণ্য দানে
লভেছি হৃদয়ে দোঁহে, কেন মোরা জান না কি প্রিয়া?
সংসার-বাসনা ত্যজি আত্মহারা হয়ে এই হিয়া
ছুটিবে উপরে আরো। মায়াময় স্বপন শৃঙ্খলে
রবে না কখনো বাঁধা, ক্ষুদ্রতা বা স্বার্থতার বলে।"

কাঁদিয়া আকুল কণ্ঠে, রাণী চেয়ে দেখে স্বর্গ হতে
দেব-আত্মা নামিতেছে; প্রিয়-ছায়া বাঁধিবে বাহুতে,
প্রসারিল কর, সংযমের উপদেশ ব্যর্থ হল তার
অধীর অশান্ত চিত্তে চারিদিক দেখে অন্ধকার।
জগতের মোহ ভুলি দেব-আত্মা স্বর্গে যায় চলে,
ছিন্নবৃন্ত পুষ্প সম, পড়ে রাণী ম্লান ধরাতলে।

তোমরা কঠিন হয়ে দোষারোপ করিও না তায়,
সকলি বুঝিত সে যে, তবু অন্ধ প্রেমের মায়ায়!

দুরন্ত আবেগ ভরে, আজি প্রাণ লভিল নির্ব্বাণ,
জগতের ছার দুঃখ:ব্যথা হতে লভিল সে ত্রাণ।
দু দিনের খেলা শেষে গেল চলি স্বর্গের ভিতরে
পুষ্প বিরচিত পথে বিচরিতে চির সুখ ভরে।

আমরা মানব ক্ষুদ্র, সহজেই আসে অশ্রুজল,
প্রকৃতির হিয়া যে গো তারি দুঃখে হতেছে চঞ্চল।
সেই সমাধির পরে দুটি গাছ জাগে পাশাপাশি,
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে শাখা রাশি রাশি।
উঠে যবে উর্দ্ধে শাখা ট্রয় দেশ দেখিবারে পায়,
অমনি সে উর্দ্ধ শাখা ম্লান হয়ে ধীরে ঝরে যায়।*

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

---

## মগের মুল্লুক।

### [ ট্যাভয় ]

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, যে কলিকাতা হইতে সহস্রাধিক মাইল দূরে, দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে, বঙ্গোপসাগর-কূলে, ট্যাভয় সহর অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ট্যাভয় আসিতে হইলে বরাবর জলপথে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানির" জাহাজে, প্রথমে কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন, পরে আবার রেঙ্গুন হইতে চড়িয়া ট্যাভয় আসিতে হয়। ট্যাভয় সহরের উভয় পার্শ্ব দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতশ্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে। সে জন্য রেঙ্গুন হইতে ট্যাভয় আসিবার সময় বড় সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। বিশেষতঃ মৌলমিন হইতে ট্যাভয় আসিতে যে মনোরম দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। বঙ্গোপসাগরের এই অংশ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া ট্যাভয় সহরের নিকট দিয়া নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে। কাজেই ট্যাভয়ের নিকটে নদী বিস্তৃত হইলেও খুব বেশী গভীর নয়। ইংরাজীতে বলিতে গেলে ট্যাভয় রিভার (Tavoy River) না বলিয়া ট্যাভয় ক্রিক্ (Tavoy Creek) বলাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত।

ট্যাভয় সহর শ্যামদেশের অতি নিকটে অবস্থিত। ট্যাভয় ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট হাউসের সম্মুখ দিয়া শ্যামদেশের সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত পূর্ত্ত বিভাগের (Public Works Department) এক রাস্তা আছে। এখানকার ডেপুটী কমিশনারের নিকট হইতে পাশ লইয়া শ্যাম দেশে যাইতে হয়। শ্যামদেশ নিকটে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। এখানে সর্ব্বদাই মিলিটারী পুলিস থাকে। তদ্ব্যতীত এখানকার পার্ব্বত্য "কিরিণ" জাতিদ্বারা আরও একদল মিলিটারী পুলিস গঠন করিয়া শ্যামদেশের সীমান্ত প্রদেশে রাখা হইয়াছে। এখানে গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ্ অফিস আছে। এস্থানের বর্ত্তমান ডেপুটী কমিশনার মিলিটারী বিভাগের লোক।

পূর্ব্বে এস্থানে দ্বীপান্তর দেওয়া হইত। আমাদের পরিচিত কাণপুর জেলার জুড়খা তেওয়ারী নামক জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আছে; তাহার বয়স প্রায় শতবর্ষ। সে ২০ বৎসর বয়সের সময় কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া এখানে দ্বীপান্তরিত হয়। এখন পনর কুড়ি বৎসরের অধিক হইল তাহার দ্বীপান্তরের অবস্থা ফুরাইয়াছে। কিন্তু সে এ দেশে বিবাহাদি করিয়া স্ত্রীপুত্রসহ মহা সুখে বাস করিতেছে। এ স্থানে এরূপ আরও কয়েক জন লোক বর্ত্তমান আছে।

এস্থানের তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে সেই কাণপুরী বৃদ্ধ, এবং যাহারা অনেক দিন এখানে বাস করিতেছে, তাহাদের মুখে এইরূপ শুনা যায়, যে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও ইহারা অর্দ্ধ উলঙ্গ থাকিত। পরে ইংরাজগণ ইহাদিগকে বর্ত্তমান ভাবে পোষাক পরিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এখন ইহারা যে ভাবে পোষাক পরে, তাহা আমাদের দেশের সাধারণ হিন্দু ঘরের স্ত্রীলোকদিগের পোষাক অপেক্ষা অধিকতর সভ্যতাব্যঞ্জক। আমাদের দেশের সাধারণ মহিলাগণ পাতলা একখানি কাপড় এককেরতা ভাবে পরিয়া তাহারই অবশিষ্টাংশ দ্বারা গাত্র আবরণ করেন। কিন্তু তাহাতে অনেক সময় লজ্জা নিবারণ হওয়াও দুষ্কর

---

* এরূপ কিম্বদন্তী আছে, যে ল্যাওডেমিয়া ও তাহার স্বামীর সমাধি-স্থলে দুটী বৃক্ষ আছে, কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দীর্ঘ হইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রকৃতি সহানুভূতি পরবশ হইয়া তাঁহাদের স্মৃতির জন্য এই বৃক্ষ দুটীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই লোকের ধারণা। ভাঃ মঃ সঃ।

হয়। ইহারা যে কাপড় পরে, তাহাকে লুঙ্গি (loungie) বলে। তাহা কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা, দেখিতে খুব বড় বালিশের খোলের মত, এবং তাহা সর্ব্বদাই পুরু এবং রঙ্গিন বা ছিটের হওয়া চাই। তাহাও স্ত্রীলোকেরা এক সঙ্গে দুখানা করিয়া ব্যবহার করে, এবং প্রথমতঃ গেঞ্জির ন্যায় আঁটা জামা গলা হইতে কোমরের নিম্ন পর্য্যন্ত এবং তদুপরি গলা হইতে কোমর পর্য্যন্ত প্রায়ই সাদা ছিটের ঢোলা জামা গায়ে দেয়। পুরুষেরা অধিকাংশই প্রায় (নিতান্ত গরীব না হইলে) প্রথমে সার্ট ও পাজামা পরিয়া তদুপরি একখানি লুঙ্গি পরে ও গলা হইতে কোমর পর্য্যন্ত একটী ঢোলা জামা গায় দেয়। পরার লুঙ্গি এবং গায়ের জামা পুরুষ এবং স্ত্রী-লোকের একই রকমের, কেবল লুঙ্গি খানা সামান্য ভিন্ন রকম করিয়া পরে। নূতন একজন আগন্তুকের পক্ষে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের প্রভেদ করা কিঞ্চিৎ কষ্টকর। কারণ পুরুষেরাও স্ত্রীলোকের ন্যায় দীর্ঘ কেশ রাখে এবং গোঁফ দাড়ি রাখে না। তবে আজ কালকার নব্য যুবকেরা অনেকে সাহেবী ফ্যাসানে চুল কাটিতে এবং গোঁফ রাখিতে শিখিয়াছে। পুরুষদের সামনে কোঁচার ন্যায় ঝুলাইয়া লুঙ্গি পরাটা একটু অধিকতর সভ্যতাব্যঞ্জক। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই এক কি দেড় হাত চওড়া, দুই তিন হস্ত পরিমিত লম্বা রেশমের রুমাল ব্যবহার করে। পুরুষেরা মাথায় বাঁধে এবং স্ত্রীলোকেরা গলায় ঝুলায়। ইহাই পুরুষ এবং স্ত্রীলোক প্রভেদ করার বিশেষ চিহ্ন। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই চটি পায় দেয়। পুরুষেরা বুট, শু, মোজাও পায় দিতে শিখিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই দীর্ঘ কেশ রাখে। এবং তাহা মাথার উপরে তুলিয়া খোঁপা বাঁধে। মেয়েরা সেই খোঁপার পার্শ্বে ফুল পরে এবং হাড়ের বা সোনার চিরুণী ব্যবহার করে। মেয়েরা মুখে পাউডার এবং তেনাখা মাখে।

তেনাখা জিনিষটী এক প্রকার বৃক্ষের ছাল। ইহা চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ব্রহ্মদেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই তেনাখা মাখে। ইহারা বলে, ইহাদ্বারা গাত্রের বর্ণ উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার হয়।

পুরুষ এবং স্ত্রীলোক চুরুট খায়। মেয়েরা যে চুরুট খায়, তাহা অর্দ্ধহস্ত পরিমিত লম্বা এবং যথেষ্ট মোটা।

সাধারণতঃ নিম্ন ব্রহ্মে, বিশেষতঃ এই ট্যাভয়তে প্রায়ই শঙ্কর জাতি দৃষ্ট হয়। খাঁটি বর্ম্মা বড় পাওয়া যায় না। এখানকার পর্ব্বত এবং জঙ্গলে আর এক জাতি বাস করে, তাহাদিগকে কিরিন বলে। তাহারা সহরবাসীদিগের তুলনায় কিঞ্চিৎ খর্ব্বকায়, অসভ্য এবং তাহাদের চেহারা ভিন্ন রকমের।

এখানে কয়েকজন সাহেবের চাউলের কারবার এবং কল আছে। এস্থান হইতে বৎসরে অনেক চাউল এই সকল সাহেবদিগের দ্বারা বিদেশে রপ্তানি হয়। এখান-কার সকল চাউলই আতপ। আমাদের দেশেও এই সকল চাউল রপ্তানি হয় এবং ইহাই রেঙ্গুন চাউল নামে অভিহিত।

বর্ম্মারা চাউল প্রস্তুত করিতে ঢেঁকি ব্যবহার করে না। এক প্রকার বড় যাঁতা আছে, দাঁড়াইয়া তাহা কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা ঠেলিয়া পিষিয়া চাউল বাহির করিয়া উদুখলে কুটিয়া বিক্রয় করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রেমকুসুম রাহা।

---

# জোসেফাইন।

নেপোলিয়নের জীবন চরিতের মধ্যে জোসেফাইনের করুণ-কাহিনী অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। উহা পড়িতে পড়িতে অশ্রুতে গণ্ডদ্বয় সিক্ত হয়, এবং মনে হয়, যেন একখানি সুমিষ্ট বিয়োগান্ত কাব্য পাঠ করিতেছি। অদ্য ভারত-মহিলায় আমরা জোসেফাইন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভারতমহিলার পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা নেপোলিয়নের নাম মাত্র শুনিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁহাদের জন্য প্রথমেই নেপোলিয়ন সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু একটী কথা বলিয়া রাখি।

মহাবীর নেপোলিয়ন ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট কর্শিকাদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। নেপোলিয়নের পিতা ইতালীর এক সম্ভ্রান্ত বংশজাত ও অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন।



নেপোলিয়ন ও জোসেফাইন।

নেপোলিয়নের মাতা কর্শিকা দ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও গুণবতী নারী ছিলেন। তিনি চরিত্র-গৌরবে সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং নেপোলিয়ন তাঁহার মনস্বিনী জননীর প্রশংসা করিতে করিতে ভক্তিতে আর্দ্র হইতেন।

নেপোলিয়ন তরুণ বয়সেই গণিত, ইতিহাস, সাহিত্য ও রাজনীতিতে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, এবং রণনৈপুণ্যে সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তিনি ফরাসী অধিকারে বাস করিয়া ফ্রান্সকেই আপনার মাতৃভূমি বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য সৈনিক বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া ফরাসী সৈন্যের অধীনে সামান্য একটি কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

কিন্তু গিরিশিখর হইতে কুজ্ঝটিকা যতই সরিয়া যাইতে থাকে, ততই হিমাদ্রির শুভ্র তুষারশৃঙ্গ যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তেমনি যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই নেপোলিয়নের অতুলনীয় প্রতিভা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। নেপোলিয়ন আপনার অসাধারণ প্রতিভা, অনুপম রণনৈপুণ্য ও অলৌকিক কার্য্যকারিণী শক্তি দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বিচিত্র বিশ্বপটে বিধাতা যে তাঁহার ন্যায় মহৎ ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার গূঢ় উদ্দেশ্য আছে; তিনি সুখের সংসারে শুধুই খাইতে, শুইতে ও ঘুমাইতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু এই জগৎ-রঙ্গভূমিতে মহা অভিনয় করিবার জন্যই আসিয়াছেন।

তাই নেপোলিয়ন আপনাকে দৈবী-শক্তিসম্পন্ন অসাধারণ মানুষ মনে করিতে লাগিলেন, এবং অলৌকিক সাহসের সহিত রণক্ষেত্রে বিচিত্র যুদ্ধাভিনয় আরম্ভ করিলেন। এই অভিনয় দেখিয়া সমগ্র ইউরোপ বিস্ময়ে অভিভূত ও ভয়ে ভীত হইয়া উঠিল। উচ্ছৃঙ্খল ফরাসী জাতি নেপোলিয়নকেই সম্রাটপদে বরণ করিল এবং ফরাসীবিপ্লবের শোণিত-সিক্ত সিংহাসন তাঁহাকেই অর্পণ করিল।

নেপোলিয়ন কিছুদিন সেই স্বর্ণ-সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। আপনার অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে ইউরোপের অধিকাংশ রাজ্যকেই স্বীয় কর্ত্তৃত্বের অধীন করিলেন; —যে ফরাসীজাতি রক্তপিপাসু দানবের ন্যায় অসিহস্তে মানবের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া রক্তের আবির খেলা খেলিতেছিল, দয়া ও ধর্ম্মকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, সেই উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দামপ্রকৃতি ফরাসী জাতির মধ্যে তিনি শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

অবশেষে নিজের বলদর্পিত দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া যখন হৃদয়ের উন্নত ও কোমল বৃত্তিকেও দলিত কুসুমের ন্যায় চরণতলে নিষ্পেষিত করিলেন, তখন আর ধর্ম্ম তাঁহার মুখের পানে তাকাইলেন না, ধর্ম্ম তাঁহার প্রতিশোধ লইলেন; তাই নেপোলিয়নের তুল্য অজেয় বীরকেও রণক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল, এবং ইংরাজের হস্তে বন্দী হইয়া, ইংরাজের নির্ম্মম প্রকৃতির নিদারুণ কাহিনী যুগ যুগান্তরের জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া, সেন্টহেলেনা দ্বীপে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল।

এই নেপোলিয়ন যখন সৈনিক কর্ম্মচারী, যখন তাঁহাকে অনেকেই ভাল করিয়া জানিত না, যখন তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা অধিকাংশ লোকের সম্মুখেই বিচিত্র ইন্দ্রজাল রচনা করে নাই, তখন একদা তিনি রাজস্ব-সচিব নেকারের রমণীয় অট্টালিকায় একটি সায়ংসমিতিতে গমন করিয়াছিলেন। সেদিন জোসেফাইন সেই অমল আলোকোজ্জ্বল গৃহকক্ষে প্রবেশ করিয়া গৃহের রমণীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার নিরুপম রূপমাধুর্য্যে ও তাঁহার মধুর কণ্ঠের মধুর আলাপে বাস্তবিকই সেই সায়ংসমিতি একটি আকর্ষণের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি যখন তাঁহার সুকোমল অঙ্গুলীর আঘাতে বাদ্যযন্ত্র হইতে সুমধুর সুর বাহির করিতেছিলেন, তখন সকলেই সেই সকরুণ ও প্রাণস্পর্শী স্বরলহরী শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ন সেই দিনই সর্ব্বপ্রথম জোসেফাইনকে দেখিতে পাইলেন।

কিন্তু নেপোলিয়নের বলিষ্ঠ হৃদয় এক দিন একটি রমণীর মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া এবং মিষ্ট কথা শুনিয়াই মুগ্ধ হইবার নহে। নেপোলিয়ন যখন জোসেফাইনের কুসুম-কান্তির মধ্যে সুকুমার হৃদয়ের পরিচয় পাইলেন ও তাঁহার গুণরাশি দর্শন করিলেন, তখনই মুগ্ধ হইলেন। সে কথা

বলিবার পূর্ব্বে জোসেফাইনের প্রথম জীবন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

জোসেফাইন যখন সরলা বালিকা, যখন তিনি বৃন্তস্থিত অস্ফুট পুষ্পকলিকার ন্যায় পিতৃগৃহেই শোভা পাইতেছিলেন, তখনই পারিসের ভাইকাউণ্ট বোহরণ তাঁহার রূপে আকৃষ্ট ও সরলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাহার পর ফ্রান্সের রাণী জোসেফাইনের মধুর স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে সখিত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু যখন ফরাসী-বিপ্লবে প্রজাগণ রাজা ও রাণীকে হত্যা করিল, তখন জোসেফাইনের স্বামীকেও প্রাণ হারাইতে হইল।

জোসেফাইন তরুণ বয়সেই বিধবা হইয়া পুত্র ইউজীন ও কন্যা হর্টেন্সকে লইয়া মনের কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ইহার পর পারিসের অরাজকতা নিবারণের ভার নেপোলিয়নের হস্তে অর্পিত হইল। নেপোলিয়ন পারিসের শোণিতপিপাসু লোকদিগের রক্তকলঙ্কিত হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। জোসেফাইনের গৃহে মৃত স্বামীর স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ তাঁহার হস্তের এক খানি তরবারি সযত্নে রক্ষিত ছিল; নেপোলিয়নের সৈন্যগণ সে তরবারিখানিও কাড়িয়া লইল। ইহাতে জোসেফাইন মর্ম্মে বড় আঘাত পাইলেন। তাঁহার শিশু পুত্র পিতার তরোয়ালখানি ফিরিয়া পাইবার জন্য নেপোলিয়নের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল।

নেপোলিয়নের হৃদয় বীরত্বে অটল অচলের ন্যায় দৃঢ় হইলেও সে হৃদয়ে বাৎসল্য ও করুণার অভাব ছিল না। পাষাণ-নির্ম্মিত শৈলদেহ যেমন রমণীয় তরুলতা ও সুষম কুসুমাবলীতে সুশোভিত হইয়া উঠে, নেপোলিয়নের পাহাড়ের মত সুদৃঢ় হৃদয়ও তেমনি সুকোমল মমতা ও সুমধুর প্রীতিতে সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়ন যখন জোসেফাইনের পুত্রের মুখপানে ফিরিয়া চাহিলেন, তখন তিনি মুগ্ধ হইলেন। কারণ, সেই দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের নির্ম্মল মুখশ্রীতে এমন একটি অনিন্দ্য লাবণ্য-রেখা অঙ্কিত ছিল, তাহার শুভ্র গণ্ড দুটি এমন এক কোমলতায় শোভা পাইতেছিল, তাহার করুণ নয়নে এমন এক অভিনব সরলতা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে রকম আর কোন শিশুর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় না,—যেন এই সুন্দর বালকটি আমাদের এই পৃথিবীর নয়, কোন্ তুষার-রাজ্য হইতে সবে মাত্র এখানে নামিয়া আসিয়াছে।

বালকটি নম্র অথচ মধুর স্বরে বলিয়া উঠিল,—"আমি আজ সেনাপতির করুণাপ্রার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমার স্বর্গীয় পিতার স্মৃতি স্বরূপ যে সুন্দর তরবারিখানি সযত্নে রক্ষা করিতেছিলাম, তাহা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। সেনাপতি যদি দয়া করিয়া সেই তরবারিখানি আমাকে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে আমার ও আমার জননীর আনন্দের সীমা থাকিবে না।"

বালকের কণ্ঠস্বরে নেপোলিয়নের হৃদয় আর্দ্র হইল। নেপোলিয়ন সেই তরবারি বালককে ফিরাইয়া দিলেন। বালক ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া পিতার তরবারি বুকে ধরিল; শিশিরসিক্ত পদ্মের ন্যায় তাহার সুরঞ্জিত গণ্ডদ্বয় নয়ন-জলে সিক্ত হইল। নেপোলিয়ন বালকের মৃত পিতার প্রতি অনুপম ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, যে জননী সন্তানের মন এমন কোমলতায় পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন, তিনি সামান্যা নারী নহেন। এই বালকের গুণবতী জননীর সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার আলাপ করিতে হইবে।

কিছুদিন পরেই জোসেফাইনের সঙ্গে নেপোলিয়নের আলাপ হইল। নেপোলিয়ন সেই নিরুপম নারীমূর্ত্তির ভিতর দিয়া তাঁহার সুন্দর মনটি দেখিয়া লইলেন। তিনি বুঝিলেন, এই তরুণীর নির্ম্মল নবনীর মত সুকুমার মুখখানিই শুধু মনোরম নহে; ইঁহার সুন্দর হৃদয়খানি ও কোমলতায় পরিপূর্ণ; ইঁহার উজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টিই শুধু প্রীতিপূর্ণ নহে, এই রমণীর অন্তর সুমিষ্ট প্রেমে সুমধুর। ইঁহার কথাই শুধু সুমধুর নহে, ইঁহার মর্ম্মের ভিতর সুধার উৎস লুক্কায়িত আছে।

নেপোলিয়ন যতই জোসেফাইনের সঙ্গে মিশিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় হৃদয়ে প্রীতির নির্ঝরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

আমরা জানি, রমণীর হৃদয় কুসুমদলের মত সুকোমল; কিন্তু তাহা সত্য হইলেও, নারী বলিষ্ঠ পুরুষকেই প্রেমের পাত্র রূপে মনোনয়ন করে; তেজস্বী পুরুষের তেজ দেখিয়াই নারীর চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তাই সহজেই নেপোলিয়ন জোসেফাইনের মন আকৃষ্ট করিলেন; নেপোলিয়নের বীরত্ব ও মহত্ব তাঁহার ধ্যানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তথাপি হঠাৎ তিনি পরিণয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন না।

কিন্তু তাহার পর জোসেফাইন যে নেপোলিয়নকে বিবাহ করিলেন, ইহা হয় ত ভারত-মহিলার অনেক পাঠক পাঠিকার কাছেই ভাল লাগিবে না। কারণ জোসেফাইনের ন্যায় বিধবা নারীর পুনর্ব্বার বিবাহ হওয়াই তাঁহারা অসঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন। সুতরাং এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

জোসেফাইন যদি ভারত-মহিলা হইতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম। প্রয়োজন হইলে, বালবিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হওয়া সঙ্গত মনে করি বটে, কিন্তু জোসেফাইনের ন্যায় যে হিন্দু বিধবার পুত্র কন্যা বর্ত্তমান, তিনিও যদি সামাজিক আদর্শ অগ্রাহ্য করেন, এবং হৃদয়ের প্রীতির উচ্ছ্বাসকে সংযত না করিয়া কোন পুরুষের আসক্তিতে নারী-মহিমা হইতে ভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে আর কিরূপে তাহা সমর্থন করি?

কিন্তু জোসেফাইনের কথা স্বতন্ত্র। তিনি ইউরোপীয় মহিলা। ইউরোপের সমাজের আদর্শ ভিন্ন প্রকার। সে দেশে পুত্র কন্যা সত্ত্বেও অনেক নারী পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। তাহাতে কেহই নিন্দা করে না। সাময়িক ও সামাজিক আদর্শ দ্বারাই সামাজিক নীতির বিচার করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ সহস্র রমণীকে বিবাহ করিয়াও শ্রেষ্ঠ পুরুষের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামী গ্রহণ করিয়াও সতীত্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে, বর্ত্তমান সমাজে তাহা করিলে, তাহাকে নিকৃষ্ট কার্য্য ভিন্ন আমরা আর কি বলিতে পারি?

অবশ্য, ইউরোপে যে নারীর উক্ত প্রকারের বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহা রহিত হওয়াই প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু যত দিন ইউরোপীয়গণ উহা দোষণীয় বলিয়া মনে না করিবে, ততদিন সে দেশে ঐরূপ বিবাহে নারীর কোন নিন্দা নাই।

এ বিষয়ে এ দেশের সঙ্গে ওদেশের কি পার্থক্য তাহা একটি কথা দ্বারা বুঝাইতে পারি। এ দেশের কোন বয়স্কা বিধবা রমণী বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহার পুত্র হয় ত আত্মহত্যা করিতে চাহিবেন, পিতা মাতা হয় ত আর কন্যার মুখ দেখিতে চাহিবেন না; সমাজে আর তাহার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। কিন্তু নেপোলিয়ন জোসেফাইনের প্রণয়ে মুগ্ধ,—এই সংবাদ শুনিয়া জোসেফাইনের পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, সকলেই তাঁহাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে জোসেফাইন তাঁহার কোন সখীর নিকট যে এক খানা পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আবার বিবাহ করিবার জন্য সকলে আমায় আবদ্ধ করিয়াছে, আমার বন্ধুগণ বিবাহ করিতে পরামর্শ দিতেছেন, * * আমার সন্তানেরা বিবাহে মত দিতে বিনতি করিতেছে। * * আমি এই সেনাপতির (নেপোলিয়নের) সৎসাহসের ও গভীর জ্ঞানের প্রশংসা করি। * * তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে, যাহা আমি প্রকাশ করিতে পারি না। * * ডাইরেক্টরগণ বলিয়াছেন যে, আমি তাঁহাকে বিবাহ করিলে নিশ্চয়ই তিনি ইটালিযাত্রী সেনার প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইবেন। গত কল্য এই কথা উল্লেখ করিয়া বোনাপার্ট বলিলেন, 'তবে কি তাঁহারা ভাবেন, আমার পদোন্নতি তাঁহাদের সাহায্য-সাপেক্ষ? কি বিষম ভ্রম! আমারই সাহায্য প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা এক দিন কত সুখী হইতে পারেন।' এই আত্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তুমি কি বিবেচনা কর? ইহা কি অত্যন্ত অহঙ্কারের চিহ্ন নহে? এক জন সামান্য সেনাপতি দেশের অধিপতিদিগের সাহায্য করিতে চায়! কিন্তু এই রূপ ঘটনা খুব সম্ভব বলিয়াও বোধ হয়। আমি জানি না, কেন যে ইঁহার আত্মগরিমায় সময় সময় আমাকে মুগ্ধ করিয়া এই বিশ্বাসে উপনীত করে যে, এই অসাধারণ

পুরুষ যাহাই করিতে সঙ্কল্প করিবেন, তাহাই সুসম্পন্ন করিবেন।" *

এই চিঠিখানি বড় সুন্দর। ইহার ভিতর জোসেফাইনের প্রীতিমুগ্ধ হৃদয়ের একখানি চিত্র যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অতিশয় মনোহর।

অতঃপর নেপোলিয়নের সঙ্গে জোসেফাইনের পরিণয় সম্পন্ন হইল। এই সময় নেপোলিয়নের বয়স ছাব্বিশ বৎসর এবং জোসেফাইনের বয়স আটাশ বৎসর হইয়াছিল।

বিবাহের পর জোসেফাইনের জীবনে যেরূপ প্রীতি ও পাতিব্রত্য পরিলক্ষিত হইল, তাহা সতীসাধ্বী হিন্দুরমণীর আদর্শেরই অনুরূপ। স্বামী কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যশস্বী হইবেন, কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন, আর পত্নী তাঁহার দেহের সুষমা, অন্তরের মাধুর্য্য এবং হস্তের সেবা দ্বারা স্বামীর মনোরঞ্জন করিবেন—স্বামীকে সর্ব্বোচ্চ সুখের অধিকারী করিবেন,—ইহাই হিন্দুনারীর আদর্শ। জোসেফাইনের জীবনেও দেখিতে পাই, নেপোলিয়ন নব নব যুদ্ধে জয়লাভ করিতেন, পদগৌরবে উন্নত স্থান অধিকার করিতেন, কিন্তু পতিপরায়ণা জোসেফাইন তাঁহার নারীহৃদয়ের সমস্ত প্রীতি, সুধা ও মাধুর্য্যের দ্বারা নেপোলিয়নকেই সুখী করিতেন। নেপোলিয়ন রণক্ষেত্রে গমন করিলে, জোসেফাইন তাঁহারই সেবার জন্য ব্যাকুল হইতেন; এক বার তিনি স্বয়ংই রণক্ষেত্রে গমন করিয়া শুশ্রূষা দ্বারা নেপোলিয়নকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিয়াছিলেন। আর একবার নেপোলিয়ন যুদ্ধের জন্য যখন বহুদূরে গমন করিয়াছিলেন, তখন জোসেফাইন স্বামীর সেবার জন্য তাঁহার কাছে যাইতে ব্যগ্র হইলেন; কিন্তু নেপোলিয়ন নানা আশঙ্কা করিয়া কিছুতেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিলেন না।

জোসেফাইন নেপোলিয়নের তুল্য বীরের বীরাঙ্গনা ভার্য্যা ছিলেন কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু নেপোলিয়নের জীবনের সুখ ও সরসতার জন্য যেরূপ প্রীতিময়ী ও সেবাপরায়ণা পত্নীর আবশ্যক ছিল, জোসেফাইন ঠিক্ সেই রকমই ছিলেন। অরুণোদয়ে তপনের তরুণ রশ্মিমালা যেমন সিন্ধুর একাংশকে স্বর্ণোজ্জ্বল করিয়া তোলে, তেমনি জোসেফাইন তাঁহার প্রীতি ও হৃদয়মাধুরী দ্বারা নেপোলিয়নের মনের একাংশকে মধুর করিয়া রাখিয়াছিলেন। সংগ্রাম, রক্তপাত, রাজ্যাধিকার লইয়াই ত নেপোলিয়ন ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার অন্তর যে শুষ্ক হয় নাই, বরং প্রেমের উচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত থাকিত, করুণা ও মমতা নিরন্তর তাঁহার অন্তরে বিরাজ করিত, কে বলিবে ইহা জোসেফাইনেরই সংসর্গের ফলে নহে?

নেপোলিয়ন সম্রাট হইয়াছেন, ইংলণ্ড এবং রুশিয়া ছাড়া আর প্রায় সমস্ত ইউরোপের উপর আধিপত্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কি সুখ পাইয়াছেন? সুখ ত পান নাই। সুখ যদি কিছু পাইয়া থাকেন, তাহা জোসেফাইনের প্রীতি ও সেবায়। নেপোলিয়ন ত একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "আমি এ জীবনে যে সুখ ভোগ করিয়াছি, তাহা জোসেফাইনের সংসর্গে।"

জোসেফাইনের সংসর্গে এই সুখ পাইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার হৃদয় জোসেফাইনের প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। জোসেফাইন তাঁহাকে এরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে, রণক্ষেত্রে ভীষণ সংগ্রামের মধ্যেও জোসেফাইনকে ভুলিতে পারিতেন না। যখন সম্মুখে শত্রুসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখনও তিনি প্রীতিতে আর্দ্র হইয়া জোসেফাইনকে লিখিতেন ঃ—

"প্রেমময়ি, কি কুহকে আমায় মুগ্ধ করিয়াছ? কি কৌশলে আমার অস্তিত্ব তোমাতেই পর্য্যবসিত করিয়াছ? যে কুহক বিস্তার করিয়াছ, কেবল আমার মৃত্যুতেই তাহার অবসান হইবে। আমার প্রেমের পুত্তলি, জানি না অদৃষ্টে কি আছে। কিন্তু যদি ভাগ্যে দীর্ঘ বিরহই থাকে, তবে তাহা আর সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না? জীবনের সহচরি, কাহার সহিত তোমার তুলনা করিব? দুঃখময় জীবনপথে আমার সহিত আবার বিচরণ করিতে তুমি সৃষ্ট হইয়াছ। যেদিন তোমার হৃদয় হইতে

* শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত 'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট' হইতে উদ্ধৃত

আমি নির্ব্বাসিত হইব, সেই দিনই আমার অস্তিত্বের বিলোপ হইবে।" *

নেপোলিয়ন জোসেফাইনের নিকট এই রূপ ত প্রেমের উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র লিখিতেন। কিন্তু পত্রের জবাব পাইতে বিলম্ব হইলে কিরূপ অধীর হইয়া পুনর্ব্বার চিঠি লিখিতেন, তাহাও দেখুন। নেপোলিয়ন লিখিতেছেন :—

"তুমি একখানি চিঠিও লেখ নাই * ইহা কি মাধুরী, কি কোমলতা কিছুরই পরিচায়ক নহে। * * তুমি তোমার মহিমান্বিত পদ হইতে একবার অবতরণ করিয়া এই ক্রীতদাসের নিকট এক ছত্র লিখ।" *

নেপোলিয়নের কি গভীর প্রেম? কিন্তু হায়, ইহার পরিণাম কি হইল? নির্ঝরিণী যেমন নদীনীরে আপনাকে একেবারে ঢালিয়া দেয়, জোসেফাইন তেমনি নেপোলিয়নের প্রেমে আপনার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন জটিল রাজনৈতিক সমস্যায় পড়িয়া সেই জোসেফাইনকেই বিনাপরাধে ত্যাগ করিলেন! সে দুঃখের কাহিনী পড়িতে পড়িতে দুঃখিনী সীতাদেবীর কথাই স্মরণ হয়, আর অশ্রুজলে নয়ন ভাসিয়া যায়।

নেপোলিয়ন ফরাসী দেশের সম্রাট হইলেন, অথচ তাঁহার সন্তান হইল না। নেপোলিয়নের অবর্ত্তমানে ফরাসীসিংহাসন লইয়া আবার কলহ হইবে—আবার নরশোণিতে ফরাসীরাজ্য রঞ্জিত হইবে। শুধু কি তাই? নেপোলিয়ন সম্রাট হইলেও রাজবংশে তাঁহার জন্ম নহে। এখন তিনি যদি জোসেফাইনকে ত্যাগ করিয়া কোন রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্তানও জন্মিতে পারে, এবং সে সন্তান ইউরোপীয় নরপতি বৃন্দের নিকট সম্মানও পাইতে পারে।

নেপোলিয়ন এই সকল কথা চিন্তা করিয়া এবং আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া, জোসেফাইনকে ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। হায়, তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, এ কুহক এক দিন ভাঙ্গিয়া যাইবে, অদৃষ্ট উপহাস করিয়া উঠিবে, এবং সাধ্বী জোসেফাইনের অশ্রুজল অভিশাপের তুল্য হইয়া তাঁহাকে অধঃপতনের শেষ সীমায় লইয়া গিয়া উপস্থিত করিবে?

নেপোলিয়ন তাঁহার সংকল্পের কথা জোসেফাইনের নিকট প্রকাশ করিলেন। জোসেফাইন শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহার জ্ঞান হইল, তখন জোসেফাইনের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তিনি মর্ম্মান্তিক স্বরে বলিয়া উঠিলেন :—

"আমার স্বামি, আমাকে বধ করিও না।"

কিন্তু হায়, নেপোলিয়ন কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হইলেন না; জোসেফাইনকে ত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। তখন জোসেফাইন স্বামীর কথার প্রতিবাদ করিলেন না, স্বামীকে একটি কর্কশ কথাও বলিলেন না; তিনি রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথে নিজের সুকুমার হৃদয় পাতিয়া দিয়া স্বামীর গন্তব্য পথ সুগম করিয়া দিলেন।

জোসেফাইন প্রকাশ্য রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ত্যাগপত্র পাঠ করিলেন; রাজ-দরবার হইতে ফিরিয়া গৃহে আসিলেন; কিন্তু তখন আর নেপোলিয়নকে স্বামী বলিবার অধিকারও তাঁহার নাই; আর কতক্ষণ পরেই সেই প্রিয় ভবন পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাটীতে গমন করিতে হইবে। হায়, সেই মুহূর্ত্তে পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী কি আর স্থির থাকিতে পারে? জোসেফাইনের আর সহ্য হইল না, তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া নেপোলিয়নের শয়নকক্ষে গমন করিলেন, এবং নেপোলিয়নের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

"আমার স্বামী! আমার স্বামী!"

দুঃখিনী নারীর নয়নজলে নেপোলিয়নের বুক ভাসিয়া গেল। অবশেষে জোসেফাইনের অশ্রুর সঙ্গে নেপোলিয়নের অশ্রু মিলিত হইল। কিন্তু ইহজন্মে আর দুইটি হৃদয় এক সঙ্গে মিলিত হইল না।

জোসেফাইনের বিয়োগান্ত জীবন-নাটকের ঘটনাবলী সংক্ষেপে প্রায় সকলই বলা হইল। এই বার তাঁহার কয়েকটি সদ্গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই রচনাটি সমাপ্ত করিব।

* শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত 'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট' হইতে উদ্ধৃত।

জোসেফাইনের সকল কথা চিন্তা করিলে, তাঁহার মধ্যে তিনটি গুণ বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, তাঁহার নিরুপম প্রীতি ও অপূর্ব্ব হৃদয়-মাধুরীর দ্বারা মানুষের মনোরঞ্জন ও মানুষকে আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতা, দ্বিতীয় তাহাঁর করুণা ও সহৃদয়তা; তৃতীয় তাঁহার নিষ্কাম পাতিব্রত্য। একটি মনোরম বৃক্ষ যেমন পত্র, পুষ্প ও ফলে সুশোভিত হইয়া উঠে, তেমনি জোসেফাইনের জীবন এই তিনটি বিশেষ গুণে ভূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে এই তিন গুণেই নারীকে নারীমহিমায় গৌরবান্বিতা করে। হিন্দুনারীর মধ্যে বিশেষ ভাবে এই গুণ সকল পরিলক্ষিত হয় বলিয়া জগতে হিন্দুনারীর এত প্রশংসা। জোসেফাইনের মধ্যেও এই গুণাবলীর সমাবেশ হইয়াছিল বলিয়া তিনি হিন্দুনারীর ন্যায় গৌরব লাভের অধিকারিণী।

জোসেফাইনের হৃদয়ের প্রীতি ও মাধুরীর কথা বিস্তৃত ভাবেই বর্ণনা করিয়াছি। তিনি এই প্রীতি ও মাধুরীর দ্বারা শুধু যে স্বামীর হৃদয়েই আনন্দ ও সুধা ঢালিয়া দিতেন, তাহা নয়। পারিসের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও নারী তাঁহার স্নেহে ও সকরুণ ব্যবহারে এবং মধুর বাক্যালাপে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; তাঁহারা সর্ব্বদাই জোসেফাইনের প্রশংসা করিতেন। ইহা স্মরণ করিয়া নেপোলিয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতেন ঃ—

"আমি রাজ্যের উপর আধিপত্য করিতেছি, আর জোসেফাইন লোকের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন।" *

জোসেফাইনের দয়া ও সহৃদয়তার উল্লেখ করিয়া নেপোলিয়ন বলিতেন,—"জোসেফাইন যেমন লাবণ্যময়ী, তেমনই দয়াময়ী ছিলেন। ফরাসী দেশে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা রমনী ছিলেন। জীবনে যে কিঞ্চিৎ সুখভোগ করিয়াছি, তাহা তাঁহারই সহবাসে।"*

জোসেফাইনের দয়া ও সহৃদয়তা দেখিয়া, কতবার কত অপরাধী ব্যক্তি তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন, নেপোলিয়নের নিকট মার্জ্জনা পাইবার প্রত্যাশায় কোমলহৃদয়া জোসেফাইনের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন। জোসেফাইন করুণায় আর্দ্র হইয়া সে সকল অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য নেপোলিয়নকে অনুরোধ করিতেন। দুঃখের বিষয় নেপোলিয়ন প্রায়ই সে অনুরোধ রক্ষা করিতেন না। জোসেফাইনের দয়া এতই অধিক ছিল যে, যে সকল দুর্ব্বৃত্ত লোক তাঁহার প্রিয়তম স্বামীকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তিনি তাহাদের দুঃখেও করুণাপরবশ হইয়া তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের জন্য পুলিস বিভাগীয় সচিব ফুসের নিকট চিঠি লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কিন্তু জোসেফাইনের এ সকল সদগুণ অপেক্ষাও নিষ্কাম পাতিব্রত্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একথা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি যে, স্বামী যখন অন্তরের প্রেম পত্নীর হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া তাহার নারীপ্রকৃতিকে চরিতার্থ করিয়া তোলেন, তখন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ রক্ষা করা কিছু মাত্র কঠিন নহে। কিন্তু স্বামী যখন মতিচ্ছন্ন হইয়া স্ত্রীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করেন, স্ত্রীকে তাঁহার প্রাপ্য প্রীতি হইতে বঞ্চিত করিয়া অতিশয় নির্ম্মম ব্যবহার করিতে থাকেন, তখন যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এবং প্রেম রক্ষা করিয়া সেবা দ্বারা স্বামীকে সুখী করিতে চাহেন,—নারীকুলে তিনিই যথার্থ পতিব্রতা।

সেইরূপ, স্বামী সুখৈশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া, পত্নীকে রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া, যত দিন তাঁহার সুখস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে পারেন, ততদিন স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সেবা ও মঙ্গল কামনা করা কিছু মাত্র কঠিন নহে। কিন্তু যখন স্বামীর ঘোর দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং স্বামী সম্পদ ঐশ্বর্য্য বিহীন হইয়া দুঃখ ও দৈন্যকে জীবনের সম্বল করেন, তখন যে পতিব্রতা নারী আপনার সুখের আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছ করিয়া স্বামীর কল্যাণের জন্য অম্লান বদনে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারেন, সেই পুণ্যশীলা নারীই যথার্থ সম্মানের পাত্রী।

জোসেফাইন ঐরূপ পতিব্রতা এবং সম্মানের পাত্রীই ছিলেন। মানুষ উদ্যান হইতে কুসুম চয়ন করিয়া যত্ন সহকারে কিয়ৎকাল দেবার্চ্চনা করে; তার পর সেই

* শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত "নেপোলিয়ন বোনাপার্ট" হইতে উদ্ধৃত।

পুষ্প আর কোন কাজে লাগিবে না বলিয়া যেমন জলে ভাসাইয়া দেয়, নেপোলিয়ন ঠিক্ তেমনি নারীরত্ন জোসেফাইনকে কিছুদিনের জন্য গ্রহণ করিয়া, কিছুদিন তাঁহার সুমিষ্ট প্রেম ও সেবা আপনার কাজে লাগাইয়া, আর তিনি ফরাসী-সিংহাসন রক্ষায় সহায় হইতে পারিবেন না মনে করিয়া তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন, এবং অন্য এক নৃপতি-তনয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। জোসেফাইনের তখন আর নেপোলিয়নকে আপনার স্বামীরূপে চিন্তা করিবারও অধিকার রহিল না। এ অবস্থায় জোসেফাইন যদি নেপোলিয়নকে বিস্মৃত হইতেন, পুনর্ব্বার কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির পত্নী হইয়া সুখী হইতেন, তবে ইউরোপীয় রীতি অনুসারে, তাঁহার কোন নিন্দা করা যাইত না।

কিন্তু জোসেফাইন কি করিলেন? তিনি নেপোলিয়নের কার্য্যে দোষারোপ করিলেন না, নেপোলিয়নের মহত্বেও সংশয় প্রকাশ করিলেন না; তিনি ঠিক্ পুরাণবর্ণিত সাধ্বী হিন্দুললনার ন্যায় নেপোলিয়নকেই জীবনের দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; এবং পদ্মটি তুলিয়া লইলেও পদ্মের গাছ যেমন শূন্য, শুষ্ক মৃণালটি সযত্নে আপনার বক্ষে ধারণ করিয়া রাখে, তেমনি নেপোলিয়ন তাঁহার প্রেম কাড়িয়া লইলেও, তিনি নেপোলিয়নের প্রেমের স্মৃতি সযত্নে আপনার মর্ম্মস্থলে রক্ষা করিলেন।

এই সময় নেপোলিয়ন জোসেফাইনকে আপনার প্রেম হইতে বঞ্চিত করিয়া যদিচ মর্ম্মান্তিক যাতনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন, নির্জ্জনে জোসেফাইনের জন্য অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, তথাপি দুই দিকে কি বিপরীত দৃশ্যই দেখা যাইতে লাগিল! এক দিকে নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যাকে সম্রাজ্ঞীরূপে পাইয়া তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য হাসিয়া হাসিয়া প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন; অন্যদিকে জোসেফাইন নেপোলিয়নের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়নজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন।

কিন্তু এই বিপরীত দৃশ্য লোকেরা আর অধিক দিন দেখিতে পাইল না। শীঘ্রই নেপোলিয়নের স্বপ্নকুহক ভাঙ্গিয়া গেল। নেপোলিয়ন ফরাসী রাজ্যের যে স্বর্ণসিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য হৃদয়ের রত্নসিংহাসন হইতে জোসেফাইনকে নামাইয়া দিলেন, জোসেফাইন নামিবার পর সে সিংহাসন ও নড়িয়া উঠিল। অবশেষে নেপোলিয়নকে সেই সিংহাসন হারাইয়া, নূতন সম্রাজ্ঞী ও তাঁহার গর্ভজাত একমাত্র পুত্র হইতেও বঞ্চিত হইয়া এল্‌বাদ্বীপে নির্ব্বাসিত বন্দীর জীবন যাপন করিতে হইল।

হায়, নেপোলিয়নের এই ঘোর দুর্দ্দিনে, তাঁহার শোচনীয় পরিণাম দর্শনে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল? কে নয়নজলে ভাসিতে লাগিল? কে তাঁহার দুঃখ দূর করিতে চাহিল? দুঃখিনী জোসেফাইন। জোসেফাইন পারিসের সকল সুখ ত্যাগ করিয়া এল্‌বাদ্বীপে গিয়া নির্ব্বাসিত নেপোলিয়নের সেবা করিতে চাহিলেন। আমরা জানি না, ইহার অপেক্ষা নারীহৃদয়ের আর কি মহত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। জোসেফাইন এইরূপ নারীমহিমায় মহিমান্বিতা ছিলেন বলিয়াই পুরাণবর্ণিত হিন্দুনারীর সহিত তাঁহার তুলনা করিয়াছি। নেপোলিয়ন জোসেফাইনের এই মহত্বের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :—

"যদিও আমি আমার সম্পদের সময় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, তথাপি তিনি আমার দুরবস্থার সময় আমার সহিত একত্র বাস করিয়া নির্ব্বাসন দুঃখভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। তিনি অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে আমার ও তৎপ্রতি আমার ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।" *

কিন্তু হায়, জোসেফাইনের এল্‌বাদ্বীপে আর যাওয়া হইল না; তাঁহার মনের আশা মনেই রহিয়া গেল! মৃত্যু তাঁহাকে অন্য রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল! ভক্ত যেমন ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে করিতে তনু ত্যাগ করেন, জোসেফাইনও তেমনি "এলবাদ্বীপ—নেপোলিয়ন" বলিয়া এই সংসারের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

অবশেষে বন্দী নেপোলিয়ন সেণ্টহেলেনা দ্বীপে

* শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত "নেপোলিয়ন বোনাপার্ট" হইতে উদ্ধৃত।

ইংরাজের বর্ব্বরোচিত ব্যবহারে নানা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া "ফ্রান্স" এবং "জোসেফাইন" বলিতে বলিতে দেহ-ত্যাগ করিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার অপরাধের জন্য জোসেফাইনের নিকট মার্জ্জনা চাহিবার অবসর পান নাই। জানি না, পরকালে কি করিয়াছিলেন। হয় ত সেখানে অশ্রুজলে জোসেফাইনের চরণ ধৌত করিয়া মার্জ্জনা চাহিয়া, আবার জোসেফাইন-কেই আত্মার সঙ্গিনী রূপে পাইয়া চিরতৃপ্তি লাভ করিয়া ছিলেন।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

---

## বঙ্কিমচন্দ্র।

১

কে জানে কেমনে দেব!
কোন পুণ্য তপোবনে,
আচরিলে সুতপস্যা,
একাসনে অনশনে।

২

যেই তপে রাজ-পুত্র
কাঁপাইয়া দশ দিশি,
সাধনায় সিদ্ধি লভি
"বিশ্বামিত্র মহাঋষি";

৩

পতিত সগর বংশ
উদ্ধার করিতে যবে,
যেই তপে ভগীরথ,
জাহ্নবী আনিলা ভবে;

৪

গুরুত্যক্ত একলব্য
যেই তপে, ঘোর বনে,
শিখেছিলা ধনুর্ব্বেদ,
বীর শিশু প্রাণ পণে;

৫

সে তপস্যা, সে শকতি,
সে সাধনা প্রাণময়ী,
তুমিই দেখালে বঙ্গে
যুগে যুগে চির জয়ী!

৬

এ অনুপ্রাণিতা মাতা
তোমারি ও মহা প্রাণে,
জাগিছে "সন্তান" সবে,
তব মাতৃস্তোত্র গানে।

৭

বুকে বুকে উথলিছে
তোমারি স্বদেশ-প্রীতি,
ধ্বনিছে গগণে তব
"বন্দে মাতরম্" গীতি!

৮

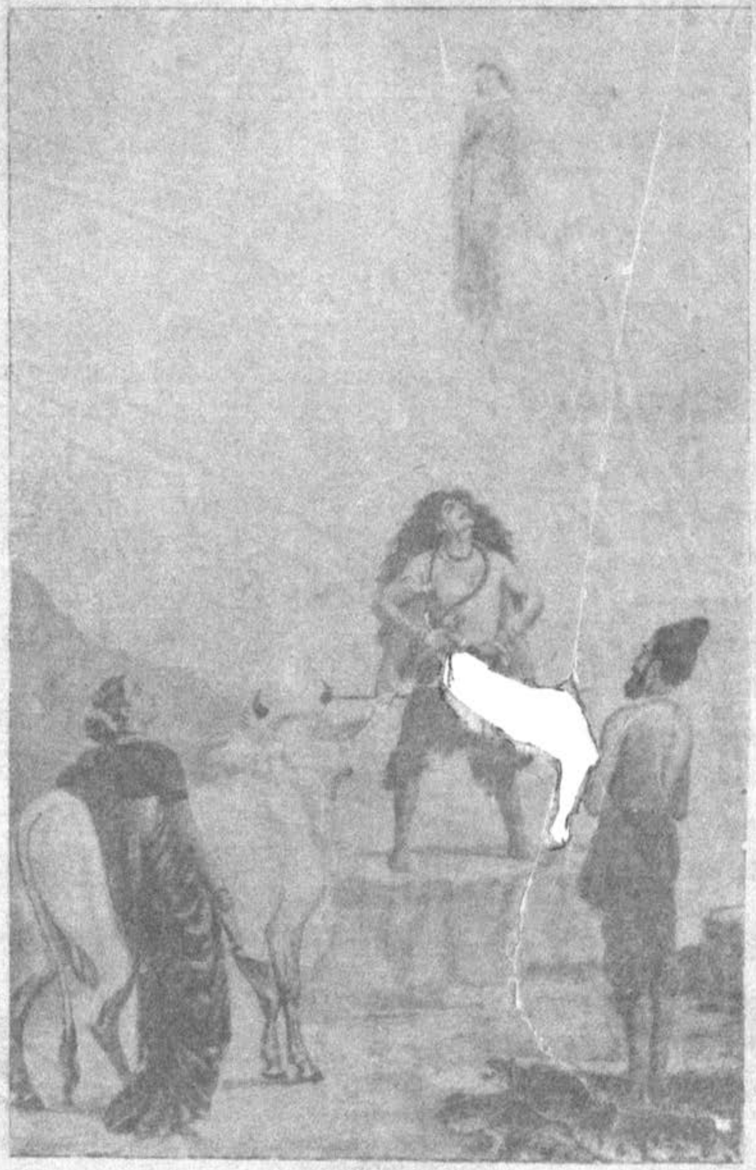
তোমারি অমৃতাশীষ
বহে প্রতি লোমকূপে,
স্বদেশীর পূজা লহ
গুরু সত্যানন্দ রূপে।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

---

## বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি।

এরূপ কথিত আছে, শিখগুরু অঙ্গদ সঙ্গীত বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। তিনি ভগবৎ সঙ্গীত রচনা করিয়া তানলয় সহকারে যখন তাহা গান করিতেন, শ্রোতৃবর্গের হৃদয় তাহাতে বিগলিত হইত, তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইত। সেই সঙ্গীতে অনেক পাপীর পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইত। তাঁহার সাধনশীল ভক্ত শিষ্যগণের রচিত সঙ্গীতও তিনি অনেক সময় গান করিতেন। তাহা দেখিয়া অনেক সুপণ্ডিত রচনাকুশল ব্যক্তি সুললিত ভাষায় সুমধুর সঙ্গীত রচনা করিয়া গুরু অঙ্গদের নিকট আনিয়া দিতেন; এবং সেগুলি



গঙ্গাবিতরণ।

গাহিতে ও স্বীয় সঙ্গীতের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন। রচনাকৌশলে ও ভাবার লালিত্যে সুন্দর হইলেও গুরু তাহা গ্রহণ করিতেন না। তিনি বলিতেন, ইহা ত সাধকের সঙ্গীত নহে, ইহার পশ্চাতে সাধনার শক্তি কোথায়? ইহাতে পাপীর মন স্পর্শ করিবে না, আমি এ সকল সঙ্গীত গ্রহণ করিতে পারি না।

বাক্যের পশ্চাতে জীবন না থাকিলে, উপদেশের পশ্চাতে সাধনা না থাকিলে, তাহা যে কোন ফল প্রসব করে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা, যাহার জীবনে কিছুমাত্র সারবত্বা আছে সেই তাহা বুঝিতে পারে, অসার লোকেরাই শুধু তাহা বুঝে না। বুদ্ধ ও চৈতন্য, যীশু ও মহম্মদ যে অল্প কয়েকটী উপদেশ জগতের নরনারীকে দিয়া গিয়াছেন, আজ কালের দিনে তাঁহাদের সকলের উপদেশাবলীকে সম্মিলিত করিয়া আমাদেরই মত এক এক জন লোক শ্রোতৃবর্গকে শোনাইতেছে। রাণা প্রতাপ বা শিবজী তাঁহার অনুগামীগণকে, ম্যাটসিনি বা গ্যারিবল্ডী তাঁহাদের দেশবাসীগণকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহা বহুগুণিত করিয়া আমাদের দেশবাসীগণকে শোনাইতেছি; কিন্তু হায়, তাঁহাদের কথা শুনিয়াই বা লোকে কেন পাগল হইত, জীবন যৌবন, ধনমান সকলই উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে কেন ব্যস্ত হইত, আর আমাদের বাক্যরাশিই বা মৃণাল-তন্তুর ন্যায় কেবল আকাশে কেন ভাসিয়া বেড়ায়? তাহাতে জীবন গড়ে না কেন?—তাঁহাদের জীবনে যে একাগ্র সাধনা, যে আত্মত্যাগ ছিল, আমাদের জীবনে তাহার অভাবই ইহার কারণ নয় কি?

এদেশে কত পণ্ডিত, কত সুধী, কত লেখক, কত কবি জন্ম গ্রহণ করিলেন, কত গ্রন্থ, কত কাব্য, কত সঙ্গীত রচিত হইল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আবাল-বৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইয়া সকলের প্রাণে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিতেছে কেন? কত উৎকৃষ্ট জাতীয় সঙ্গীত এদেশে রচিত হইয়াছে, কিন্তু সকলের উপরে ইহা স্থান পাইল কিরূপে? ইংরেজের বৃত্তিভোগী, ইংরেজ-রাজের প্রসাদভোগী বঙ্কিমচন্দ্র সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর—রাজ সেবার পর—যে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত দেহমন লইয়া গৃহে ফিরিতেন, সেই উচ্ছিষ্ট শক্তি দিয়া তিনি সাহিত্য সেবা করিতেন, ইহাই ত আমাদের ধারণা! সেই ক্লান্ত মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত "বন্দে মাতরম্" এত প্রভাবসম্পন্ন হইল কিরূপে? কোন্ শক্তি বলে আজ জগতের এক অন্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়িল? বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর সাধনার বলে।

সুপ্রসিদ্ধ মুশলমান তপস্বিনী রাবেয়া প্রথমে ক্রীতদাসী ছিলেন। তাঁহার ভক্তিপরায়ণ হৃদয় সর্ব্বদা ঈশ্বর সহবাসে যাপন করিতে ব্যস্ত থাকিত। কিন্তু দুর্দ্দান্ত প্রভুর পীড়নে তাঁহাকে সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হইত। গভীর রজনীতে অবসর পাইয়া তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন,—"হে প্রভু, তুমি জান, তোমার পূজা অর্চ্চনার জন্য আমার প্রাণ কত লালায়িত, কিন্তু সমস্ত দিনমানে একটু সময় পাই না, যে ইচ্ছামত তোমার চরণে বসি; তাই দিবসের কর্ম্মের অবসানে তোমার নিকটে আসিয়াছি।" মথিত দুগ্ধের উপরিভাগে নবনীত যেমন ভাসিতে থাকে, চালকলার নৈবেদ্যের উপরে পবিত্র পুষ্প যেমন বিরাজ করে, রাবেয়ার দিনমানের প্রভুসেবার উপরে ভগবদ্ভক্তি তেমনই ভাবে বিরাজ করিত। ইহা অপেক্ষা অকৃত্রিম প্রীতি ও সাধনা আর কি হইতে পারে? আমাদের মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সকল দৈনিক রাজসেবার উপরিভাগে গভীর স্বদেশানুরাগ, দেশজননীর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি এইরূপ ভাবেই বিরাজ করিত।

শুনিয়াছি, 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত রচনা কালে বঙ্কিম-চন্দ্রের মনে দিবানিশি ঐ চিন্তাই জাগ্রত থাকিত। একদা রাত্রি দুই ঘটিকার সময় এই সঙ্গীতটীর রচনা শেষ হয়। সেদিন তাঁহার বাড়ীতে একজন সুহৃদ উপস্থিত ছিলেন। সেই গভীর নিশীথে তিনি তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "হয়েছে, হয়েছে, আমার জাতীয় সঙ্গীতটী প্রস্তুত হয়েছে।" এক জন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মুখে 'বন্দে মাতরম্' রচনা সম্বন্ধে এই কথাগুলি শুনিয়াছি; বোধ হয় এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার

কারণ নাই। কিন্তু একথা সত্য হউক বা না হউক, 'বন্দে মাতরমের' মধ্যে যে প্রাণপ্রদ শক্তি আছে, গভীর একাগ্র সাধন বিনা তাহার উৎপত্তি অসম্ভব।

চিন্তা করিলে মনে হয়, এদেশে বর্ত্তমান যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের মত দেশের কথা কে আর ভাবিতে পারিয়াছেন? অনেকে তাঁহা অপেক্ষা অধিক সময় ও শক্তি দেশহিতে অর্পণ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু বাহিরের কর্ম্মের কথা বলিতেছি না। দেশচিন্তায় তন্ময় হইয়া, বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া, এমন ভাবে কে আর স্বদেশজননীর ধ্যান ও আরাধনা করিয়াছেন? চিন্তাশীল সাধকেরা সাধন বলে যে আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করেন, জগতের সাধারণ নরনারী তাহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ঋষিগণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বলে দৃশ্যের অন্তরালে অদৃশ্য অন্তরাত্মাকে দেখিয়া তাঁহারই কথা জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর কোটী কোটী নরনারী সেই সত্য গ্রহণ করিয়া আপন আপন আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ঋষি ছিলেন, দেশের কোটী কোটী লোক যখন দৃশ্যমান বাহির লইয়া ব্যস্ত ছিল, তিনি তখন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া একনিষ্ঠ গভীর সাধন বলে দেশের তরুলতা ও সাগর উপসাগরে, নদ নদী ও গিরি পর্ব্বতে, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে দেশজননী রূপ দেবতার স্পন্দন ও আবির্ভাব অনুভব করিতে পাইলেন। গভীর ধ্যানযোগে তিনি যে সত্য লাভ করিলেন, আপনার অমর লেখনীর মুখে সেই সত্যই তিনি প্রচার করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী সেই সত্য তখনই গ্রহণ করিতে পারিল না। শিশু ব্রাহ্মণতনয় প্রথমে যখন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করে, তখন সে তাহার অর্থ আয়ত্ত করিতে পারে না, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করিতে করিতে সে সেই গায়ত্রীর ভিতরে জগৎ-প্রসবিতার ধী ও শক্তি অনুভব করে। পঁচিশ বৎসর 'বন্দে মাতরম্' প্রায় উপেক্ষিত অবস্থায় প্রাণহীন ভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যে পড়িয়া রহিল, বাঙ্গালীর জীবনে তাহার প্রভাব প্রকাশ পাইল না। এই পঁচিশ বৎসরে বাঙ্গালীর তরুণ স্বদেশানুরাগ কিঞ্চিৎ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া অনুভব করিল, "বন্দে মাতরম্" দেশানুরাগের প্রকৃত গায়ত্রী মন্ত্র বটে। অন্তর্নিহিত অমর শক্তি লইয়া "বন্দে মাতরম্" বীজ শুষ্ক অনুর্ব্বর ভূমিতে পড়িয়াছিল, বন্যা আসিয়া সেই ভূমিতে পলি ঢালিয়া ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া গেল, অমনি সেই অমর বীজ অঙ্কুরিত হইয়া শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করিল।

পঁচিশ বৎসর অনাদরে পড়িয়া থাকিয়া যে মন্ত্র, যে সঙ্গীত এত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহার শক্তির উৎস কোথায়? কল্পনার ক্রীড়াকৌতুকে,—অথবা ভাষার বাঁধুনীতে? এসংসারে শুদ্ধ কল্পনা অথবা কেবল ভাষার লালিত্যের এত প্রভাবের প্রমাণ ত কোথাও নাই। গভীর সাধনায় এ সঙ্গীতের শক্তি। যে অন্তর্নিবিষ্ট ধ্যানে ইহার সৃষ্টি সেই ধ্যান-পরায়ণতাতেই ইহার প্রভাব। বাঙ্গালী এখনও এই সাধনের ধন 'বন্দে মাতরম্' ভাল করিয়া সাধন করিতে পারে নাই, তাই এখনও ইহার পূর্ণ শক্তি প্রকাশিত হয় নাই। মনে হয়, এখনও ইহা শুধু কোটী কোটী বাঙ্গালীর কণ্ঠেই রহিয়া গিয়াছে, অন্তরে সাধনার বস্তুরূপে প্রবেশ করে নাই। যখন বাঙ্গালী এই মন্ত্র আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে, সে জন্য সাধন করিবে, তখন এদেশের শ্রী ফিরিয়া যাইবে।

সাময়িক উচ্ছ্বাস, আর গভীর সাধনা এই দুইয়ে প্রভেদ অনেক। উচ্ছ্বাসে অনেক কাজ হয়, একথা স্বীকার্য্য, কিন্তু সাধনা না থাকিলে সে উচ্ছ্বাসের ফল অতি সামান্য। অনেক সময় উচ্ছ্বাসে সাধন-প্রবৃত্তি জন্মায়। বর্ত্তমান দেশব্যাপী উচ্ছ্বাসে যদি বঙ্গবাসীর মনে এই সাধনানুরাগ জন্মাইয়া দেয়, তবেই এই উচ্ছ্বাস সার্থক। শুধু সাধন বলেই কণ্ঠের 'বন্দে মাতরম্' অন্তরে প্রবেশ করিবে, অন্তর হইতে অন্তরতম মর্ম্মে, সকল অস্তিত্বে ব্যাপ্ত হইবে। এখন বঙ্গে যে 'বন্দে মাতরং' উচ্চারিত হয় তাহাতে, আর সাধনাসিদ্ধ ব্যক্তির উচ্চারিত 'বন্দেমাতরম্'-এ আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখা যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে উচ্ছ্বাস কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি বড়ই মনোক্লেশ ভোগ করিতেছেন, ক্লেশ হইবারই কথা। আমরা মনে করিতাম;

আমাদের স্বদেশ-প্রেম বঙ্গবিচ্ছেদ আন্দোলনে খুব দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। এখন যখন দেখা যাইতেছে, আমাদের ধারণা ভ্রমাত্মক, যাহা আমরা সাচ্চা মনে করিতাম তাহা অনেক পরিমাণে ঝুটা, তখন মনোক্লেশ হওয়াই ত স্বাভাবিক। কিন্তু যাহা বাস্তবিকই ঝুটা, যতই মনোক্লেশ হউক না, তাহা ঝুটা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতেই আমাদের মঙ্গল। গ্রীষ্মতাপিত দেশে হঠাৎ যদি তর তর করিয়া বন্যার জলের আবির্ভাব হয়, সেই বন্যার জল পান করিয়া আমরা আপাততঃ তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি, খুব আনন্দও করিতে পারি, কিন্তু যদি সেই বন্যাকে স্থায়ী মনে করি, তবে আমরা কি আত্মপ্রতারিত হই না? বাঙ্গালীর তরল মেরুদণ্ডবিহীন জীবন যদি একবার বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে দাঁড়াইতে সমর্থ হইল, তবে তাহা যে চিরকালই সেই বাহ্যশক্তি প্রভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে, এরূপ দুরাশা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এই স্বদেশী আন্দোলন যদি আমাদিগের মনে এই প্রতীতি জন্মাইয়া দিয়া থাকে, যে শুধু ইচ্ছা করিলেই প্রকৃত দেশভক্ত হওয়া যায় না, চরিত্রকে পবিত্র, জীবনকে উন্নত—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় সমঞ্জসীভূত ভাবে উন্নত—না করিতে পারিলে দেশসেবক, দেশভক্ত হইতে পারা যায় না, তবেই আন্দোলন সার্থক হইয়াছে মনে করিব। দেশ-মাতার পূজা শুধু কথায় বা ইচ্ছায় হয় না, সাময়িক প্রবল উচ্ছ্বাসে বা স্বার্থত্যাগেও হয় না। তাহার জন্য নীরব সাধনা চাই। ধীরে, নীরবে স্বদেশ সেবার জন্য কঠোর সাধনা আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালীর লঘু চরিত্র এরূপ সাধনার অনুকূল নহে। এই যে বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন, ইহার ফলে কত দেশ-হিতৈষীর ডাক হাকই না আমরা শুনিলাম, জলে জল-বিম্বের ন্যায় তাহারা এখন দেশের জন সাধারণের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

পাশাপাশি আর একটী দৃষ্টান্ত রাখিতেছি। ভারতের সুসন্তান স্বদেশার্থ-উৎসর্গীকৃত-জীবন মহারাষ্ট্রকুলতিলক মহামতি গোখলের কথা বলিতেছি। তিনি আমাদের ভক্তিভাজন জনৈক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "বঙ্গদেশ হইতে আমাদের "ভারত-সেবক" (Servant of India) দলে তিন জন যুবক দিন্।" উক্ত বন্ধু এদেশে প্রায় সর্ব্ব সাধারণের পরিচিত তিনটী যুবকের নাম করেন, এবং অন্যান্য গুণের মধ্যে তাঁহারা কেমন সুন্দর বক্তৃতা করিয়া থাকেন তাহারও প্রশংসা করেন। গোখলে বলিলেন, "ভারত-সেবক সমিতিতে প্রবেশ করিলে পাঁচ বৎসর কাল বক্তৃতা করিতে পারিবে না, আর যাহারা এই অল্প বয়সেই বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছে, তাহা-দিগকে ত আমরা কিছুতেই গ্রহণ করিব না, তাহারা অসার লোক না হইলে এই অল্প বয়সেই কি উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করে?" গোখলের এই সমিতিতে শুনিয়াছি অতি অল্পসংখ্যক লোকই প্রবেশ করিয়াছেন; হউক সংখ্যায় অল্প, কিন্তু ইঁহারা যে একনিষ্ঠ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার বলে তিনটী চারিটী লোক পাঁচ বৎসর পরে যে শক্তি দেশে সঞ্চার করিতে পারিবেন, শত শত বাঙ্গালী 'martyrs'—অর্থাৎ তথাকথিত 'দেশার্থ-উৎসর্গীকৃত-জীবন' মানুষ তারস্বরে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া তাহার সহস্রাংশের একাংশও করিতে পারিবে না। ভগবদ্ভক্ত কবি গাহিয়াছেন, 'ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না,' স্বদেশ-ভক্তিও সাধন বিনা মিলে না। সাধন বিনা দেশসেবায়ও প্রকৃত অধিকার জন্মে না। বঙ্কিমচন্দ্র "সন্তান সম্প্রদায়ের" সাধনা আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেখাইয়াছেন, মাতৃভূমির সেবার অধিকার কত সাধনসাপেক্ষ। স্বয়ং লোকচক্ষুর অগোচরে নীরবে গভীর সাধনা করিয়া দেখাইয়াছেন, সাধন বলে, সাধন-লব্ধ মন্ত্র বলে কোটী হৃদয়ে কেমন বিদ্যুৎ ছুটে। সাধন বিনা যাহা মিলে না, শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসে কি তাহা মিলিতে পারে? কখনই না। আমরা দেশের এই উচ্ছ্বাস দেখিয়া যদি মনে করি, বাঙ্গালী চিরকালের তরে জাগিয়াছে, তবে তাহা ভ্রান্তি, আত্মপ্রতারণা মাত্র। "এবার মরাগাঙে বান এসেছে" —ইহা বানমাত্র, স্থায়ী স্রোত নহে। বান ক'দিন থাকিবে?

এই উচ্ছ্বাসের প্রকৃত উপকারিতা আমাদিগকে সাধনে অনুরাগী করা। এই উপলক্ষে যদি দেশের দশ পাঁচটী নরনারী সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া দেশকে ভাল বাসিতে

আরম্ভ করেন, তবেই এই আন্দোলন দৃঢ় হয়। দেশকে ভালবাসা সোজা কথা নয়, দেশকে ভালবাসিতে গেলেই জীবন গড়িতে হইবে, খাঁটি মানুষ হইতে হইবে। সমাজের পাপ আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে। দেশের জরাজীর্ণ জীবনে নব শক্তির সঞ্চার করিতে হইলে দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি বিনা গত্যন্তর নাই। আভ্যন্তরীণ উন্নতির প্রধান কথা, প্রথম কথা, নারীজাতির উন্নতি। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা কি, আমরা বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

---

## জাপানের বালিকাবিদ্যালয়।

ইউরোপ ও আমেরিকায় নারীগণ যেরূপ সম্মান লাভ করেন, এশিয়া খণ্ডের কোন দেশেই তাঁহারা সেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন না। জাপানী মহিলা এবিষয়ে প্রাচ্য ভূখণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী। অতি প্রাচীন কালে জাপানে পুরুষ ও নারীর অধিকার ও সম্মান তুল্য ছিল। নারীগণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেশ শাসন করিতেন, অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতেন, যুদ্ধে সেনা-নায়কের কার্য্য করিতেন এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়া পুস্তকাদি রচনা করিতেন। ভারতবর্ষ ও চীন দেশ হইতে নারীজাতি সম্বন্ধে সংকীর্ণ ভাব জাপানে প্রবেশ করিয়া জাপান-নারীর দুর্গতির পথ উন্মোচন করে। ক্রমে ক্রমে নারীগণ পুরুষ-জাতির ক্রীড়াপুত্তলিতে পরিণত হন। ভদ্রমহিলাগণ অতি নিরীহ, অশিক্ষিত জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের আর পুরুষগণের কর্ম্মময় জীবনের সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ততা রহিল না। জাপানী পুরুষগণ তখন বিলাসিনী "জেইসা" নাম্নী নর্ত্তকীগণের প্রতি অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। প্রাচীন গ্রীসে যখন প্রাচ্যখণ্ডের নারীজাতি বিষয়ক সংকীর্ণ ভাব সকল প্রবেশ করিয়া নারীজাতির দুর্গতি আনয়ন করিয়াছিল, ভদ্র মহিলাগণ যখন তাঁহাদের উচ্চ পদবী হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তখন গ্রীসেও "হেটাইরা" নাম্নী সুমার্জ্জিতা বারবিলাসিনী-দিগের প্রভাব এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

অন্যান্য বিষয়ে যখন জাপানে নবযুগের সূত্রপাত হইল, তখন জাপানী মহিলার অদৃষ্টাকাশের অন্ধকারও দূর হইবার সূচনা হইল। এখন তাঁহাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং নূতন আইন কানুন প্রবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাদের অবস্থার প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে উচ্চ বংশোদ্ভূত এক দল জাপানী বালিকাকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার জন্য আমেরিকা প্রেরণ করিবার প্রস্তাব হয়। জাপান-সম্রাট ও জাপানের নেতৃবর্গ এক বাক্যে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "জাপানের ভবিষ্যদ্বংশের উন্নতি সাধনের জন্য, জগতের সভ্য জাতি সমূহের সমকক্ষ হইবার জন্য, জাপানজাতির উন্নতি সাধন আবশ্যক, কিন্তু পিতা মাতা উভয়েই উন্নত না হইলে ভবিষ্যৎ বংশ কখনও ভাল হইতে পারে না। যে সকল জাতি নারীদিগের উন্নতির প্রতি উদাসীন হইয়া শুধু পুরুষদিগের উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।" তাঁহাদের অভিমত অনুসারে এক দল জাপানী বালিকা আমেরিকায় প্রেরিত হইল, এবং সেখানে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া জাপানের নারীজাতি ও স্বদেশের উন্নতি সাধনে আপনাদের উপার্জ্জিত জ্ঞান ও শক্তি নিয়োগ করিল। জাপানের উন্নতির ইতিহাসে ইহা একটী অতি মূল্যবান ও শিক্ষাপ্রদ অধ্যায়।

কিন্তু এখনও জাপানে নারীর কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ। বিবাহ এবং ঘর সংসারের কর্ম্মের বাহিরে তাঁহারা অতি অল্প কার্য্যই করিবার সুযোগ পান। এক মাত্র শিক্ষা-বিভাগে মহিলাগণ প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের বেতন যৎসামান্য। এই বিভাগেও আবার তাঁহারা বিদ্যালয় পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হন না। পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে তাঁহারা এখনও বিদ্যালয়ে শাসন ও কর্ম্মাধ্যক্ষতার পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্রমে এই সকল বাধা দূর হইতেছে। ছাত্রদিগকে যে প্রকার যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া হয়, ছাত্রীগণকেও সেই প্রকার সুশিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইতেছে। সংকলিত। (ক্রমশঃ)

---

## এ মাসের চিত্র।

এই মাসে ভারত-মহিলায় যে চারিখানা চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে প্রথমখানি "সান্ত্বনা দেবী ও পুত্রশোকাতুরা জননী" বোগারো নামক জনৈক বিখ্যাত ফরাসী শিল্পীর সর্ব্বজন-সমাদৃত চিত্র হইতে গৃহীত। ঈশ্বরের স্বরূপ গমূহকে পুরুষ ও স্ত্রী আকারে কল্পনা করা সকল দেশেই প্রচলিত। শোকার্ত্ত নরনারী সংসারের শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া প্রেমময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তিনিও শরণাগতকে সান্ত্বনা দিয়া থাকেন। তাঁহার এই শক্তি "সান্ত্বনা দেবী" রূপে কল্পিত হইয়াছে। সান্ত্বনা দেবীর দৃষ্টিতে করুণা ও শান্তি কেমন সুন্দর প্রকাশিত। দুঃখিনী জননীর পুত্রটীর মৃত্যু হইয়াছে, তিনি সান্ত্বনার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহার আকৃতি কি সুন্দর স্বাভাবিক ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে।

তৃতীয় চিত্রটী নেপোলিয়ন ও জোসেফাইনের। বোধ হয়, নেপোলিয়ন যখন জোসেফাইনের নিকট তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার কথা প্রথম বলিতেছেন, ইহা সেই সময়ের চিত্র। জোসেফাইন পুস্তকাধ্যয়নে নিবিষ্টা ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইয়া ভীত, বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। নেপোলিয়নের মুখ ও অপ্রসন্ন এবং গম্ভীর।

চতুর্থ চিত্রটী রবিবর্ম্মার অঙ্কিত গঙ্গাবতরণ। রামায়ণের আখ্যায়িকা অবলম্বনে কল্পিত। সগর-বংশ উদ্ধারের জন্য গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে ভূতলে আনয়ন করিবার জন্য ভগীরথ কঠোর তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে প্রসন্ন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পতনবেগ ধারণ করিবার শক্তি শুধু মহাদেবেরই আছে, তিনি গঙ্গার ধারা মস্তকে গ্রহণ না করিলে পৃথিবী সেই পতনবেগে রসাতলে যাইবে। ভগীরথের সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব গঙ্গার ধারা মস্তকে ধারণ করিবার জন্য উপস্থিত। সমগ্র মানসিক বল একত্রিত করিয়া তিনি সেই বেগ ধারণের জন্য দণ্ডায়মান।

ক্রমে ক্রমে অন্যান্য চিত্রের সহিত ভারত-মহিলায় রবিবর্ম্মার আরো অনেকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইবে।

---

## ম্যাট্‌সিনি।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

ম্যাট্‌সিনি অসংখ্য বাধা ও প্রতিবাদ ঠেলিয়া অপ্রতিহত বেগে ইটালীর উদ্ধার-সাধন যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি "ইয়ং ইটালীর" আদর্শে "ইয়ং সুইজারল্যাণ্ড" এবং "ইয়ং ইউরোপ" নামক দুইটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও কয়েকবার তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। তাঁহার মনের উপর দিয়া যখন বিষম ঝড় বহিয়া যাইতেছিল তখনও তিনি কাজ করিতে বিরত ছিলেন না। নানা প্রকার সমিতি স্থাপন করিয়া, লিখিয়া, স্বীয় আদর্শকে ফলবান করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই অসীম সহিষ্ণুতা এবং কার্য্যশক্তি মহৎ প্রেম হইতে সম্ভূত। তাঁহার প্রেম কত সুগভীর, তাহার নিদর্শন এই সময়ের কয়েকটি ঘটনা হইতে পাওয়া যায়। এতদিন আমরা তাঁহাকে কর্ম্মব্যস্ত ম্যাটসিনিই দেখিয়াছি; এইবার তাঁহাকে প্রেমিক ম্যাটসিনি রূপে দেখা যাইবে। তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় না পাইলে প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে জানাই হয় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তিনি গৃহে সকলেরই অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতই প্রেমিক ছিল। ছাত্রাবস্থাতে তিনি বন্ধুদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এই সময় তিনি দুইটি বালিকাকে ভালবাসিয়াছিলেন; কিন্তু সেই বাল্য প্রণয় স্থায়ী হয় নাই। যখন তিনি ইটালী পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার মাতা এবং মাতৃস্থানীয়া ম্যাডাম রাফিনি তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া ছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের প্রেম সকল বাধাবিঘ্ন ও কর্ম্মবহুলতা অতিক্রম করিয়া বিকশিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তিনি অতি উন্নত ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি এক স্থানে

বলিয়াছেন:—"নারীকে ভালবাস এবং সম্মান কর; তাঁহাদের নিকট কেবল আরাম চাহিও না; তাঁহারা শক্তি ও উদ্দীপনার উৎস স্বরূপ। * * * স্ত্রীপুরুষ এক বীণার দুটি তন্ত্রী, একটি ব্যতীত অপরটি অর্থহীন।" তিনি বিবাহ ব্যাপারকে অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। ক্রমশঃ আমরা দেখিব, তাঁহার হৃদয় কতটা প্রেমিক ও প্রেমপিপাসু ছিল। কিন্তু তাহাতে চপলতা ছিল না। একদিকে যেমন তাঁহার হৃদয় প্রদীপ্ত প্রেম ও গভীর সহানুভূতির আলয় ছিল, অপর দিকে তাঁহার অন্তরে সুদৃঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান-সঞ্জাত সংযম ও দৃঢ়তারও অভাব ছিল না। তিনি সহজে "প্রেমে পড়ার" পাত্র ছিলেন না, কিন্তু মহিলাদিগের মধ্যে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরও অভাব ছিল না।

ম্যাটসিনির প্রেম কি সুন্দর, কতটা পূর্ণায়তন ও গভীর এবং কত পবিত্র, তাহা বুঝিতে হইলে উহাকে দুই অংশে ভাগ করিয়া দেখিতে হয়। একদিকে তাঁহার মাতা এবং ম্যাডাম রাফিনির প্রতি শ্রদ্ধা, অপর দিকে জিয়োভানী সিডোলী ও অপর একটি বালিকার প্রতি ভালবাসা। মাতার কর্ত্তব্যজ্ঞানময়, সহিষ্ণু, অপেক্ষাকারী, সন্তান-গৌরবোজ্জ্বলিত প্রেম, এবং ম্যাডাম রাফিনির বিশ্বাসপূর্ণ, স্নেহবিহ্বল, সুকোমল, মঙ্গলকারী বাৎসল্য ম্যাটসিনির জীবনের উপর, হৃদয় ও মনের উপর, চিরদিন অমৃতময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

জিয়োভানী সিডোলীর সহিত যখন ম্যাটসিনির প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বিধবা। তাঁহার স্বামী স্বদেশের জন্য নিগৃহীত ও স্বদেশ হইতে নির্বাসিত বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে সিডোলীকে আত্মব্রতে দীক্ষিত করিয়া যান। সিডোলী বাল্যকাল হইতেই স্বদেশ-প্রেমে পূর্ণ ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আরও গভীর ভাবে দেশের কাজে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে ম্যাটসিনির সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। তাঁহাদের উভয়ের স্বদেশ-প্রীতি, জীবনব্রতের একতা এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমশঃ প্রেমে পরিণত হইল। ম্যাট্সিনি সিডোলীকে বাক্ দান করিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই ম্যাট্সিনি তাঁহার ভাবী পত্নীকে তাঁহার দূত স্বরূপে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ফ্লোরেন্সে পাঠাইলেন। সে সময় একজন নারীর পক্ষে এইরূপে বিদেশ গমন অত্যন্ত বিপদজনক ছিল, প্রতিমুহূর্তে কারারুদ্ধ হওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু ম্যাট্সিনির ও সিডোলীর প্রেম এমনই সবল ও নির্ভীক ছিল, যে তাঁহারা কেহই এই ব্যাপারে বিচলিত হইলেন না। এই সময় তাঁহাদের মধ্যে যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা রাজকর্ম্মচারীগণ খুলিয়া পড়িয়া নকল করিয়া লইয়া তবে পাঠাইয়া দিতেন। সেই পত্রাবলীর একখানিতে ম্যাট্সিনি লিখিয়াছেন, "তোমার পত্রের অনেক শব্দ এখনও আমার হৃদয়ে আনন্দের কম্পন আনয়ন করে। * * * * আমি তোমার কেশগুচ্ছ চুম্বনে আচ্ছাদিত করিয়াছি।" অপর এক জন বন্ধুকে আর একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, "তিনি যতটা ভাবেন, আমি তাঁকে তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি। দিন রাত্রি আমার মন তাঁর চিন্তায় পূর্ণ থাকে।" এক ভাবের ভাবুক, এক পথের পথিক, দুইটি পবিত্র মহৎ হৃদয়ের এই সুগভীর সতেজ প্রদীপ্ত ও ব্যাকুল প্রেম কি সুন্দর! এই প্রেম চিরদিন স্থির ছিল। কিন্তু ম্যাট্সিনির অবসরহীন কর্ম্মব্যস্ত গৃহহীন জীবন বিবাহের অন্তরায় হইয়া তাঁহাদের মধ্যে যে সুদীর্ঘ ছাড়াছাড়ি আনয়ন করিয়াছিল, তাহা শেষ জীবনে তাঁহাদের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল।

আর একটী নারী,—একটী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। যখন ম্যাট্সিনি গোপনে নানা স্থানে বাস করিতেন, সেই সময় কোন পরিবারে অবস্থান কালে এই কুমারীর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। এই কোমলহৃদয়া নারী প্রথমে করুণাবশতঃ গৃহহীন ম্যাটসিনির প্রতি আকৃষ্ট হন, তৎপরে তাঁহার শিষ্যার স্থান অধিকার করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা আকৃষ্ট হন। অবশেষে ম্যাট্সিনির হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া প্রমত্ত প্রেমে আত্মহারা হইয়া পড়েন। কিন্তু ম্যাট্সিনির মনে ভাই বোনের মত একটা প্রীতির ভাব জন্মিয়াছিল মাত্র। যখন ম্যাট্সিনি লণ্ডনে চলিয়া

গেলেন, তখন তাঁহার বিরহে এই বালিকা ক্রমশঃই নিদাঘে পুষ্পের ন্যায় ম্রিয়মাণ হইতে লাগিলেন। বন্ধুগণ যখন প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলেন, তখন তাঁহারা ম্যাট্‌সিনিকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া একবার আসিয়া দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের পত্র পাঠ করিয়া ম্যাট্‌সিনির হৃদয় ক্রন্দন করিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি যে সিডোনীকে বাক্য দান করিয়াছেন! তিনি বুঝিলেন, এ অবস্থায় তাঁহার সাক্ষাৎ সুফল প্রসব করিবে না। মন একবার তাঁহার কাছে যাইবার জন্য এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য ব্যাকুল হইল, তবুও যাইতে পারিলেন না। তিনি বন্ধুদিগকে লিখিলেন, "তোমরা তাঁহার নিকট কেবল আমার দোষের উল্লেখ করিয়া আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ কমাইতে চেষ্টা কর।" কত কষ্টে, নিতান্ত বাধ্য হইয়া তিনি উক্ত পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ও সেই বালিকার প্রতি কত আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে বুঝিতে পারা যায়। "আমি যে সহজে এমন পবিত্র প্রফুল্লহৃদয় পুষ্পটিকে আমার ভাব, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও প্রেমের সিঞ্চনে রক্ষা করিতে চাহিতেছি না, তাহা নহে।"

সেই কোমল-হৃদয়া বালিকা, ম্যাট্‌সিনির প্রতি উত্থিত প্রেম-হোমানল-শিখা আত্মীয় বন্ধুগণের শত চেষ্টাতেও প্রশমিত করিতে পারিলেন না; অচিরে তাহাতে আত্মাহুতি দিয়া অমৃতধামে চলিয়া গেলেন। ধর্ম্মপ্রাণ, বিশ্বাসী, পরম প্রেমিক ম্যাট্‌সিনি আকুল হৃদয়ে পরলোকের পানে চাহিয়া বিশ্বাস করিলেন, সেখানে একদিন মিলন হইবে। অতৃপ্ত প্রেমের দহনে ম্যাট্‌সিনির জীবন জর্জ্জরিত ছিল। তিনি এই ঘটনার বহু দিন পরে কোনও বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "ঘটনা-চক্রে যাহার ভাগ্যে প্রেমের আবেষ্টনময় স্নিগ্ধ পারিবারিক জীবন সম্ভব হয় না, তাহার হৃদয়ের শূন্যতা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। এ বিষয়ে আমি একজন ভুক্তভোগী।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

---

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

**ইংরেজী বর্ষের শেষ সপ্তাহ**—এখন প্রতি বৎসরই ইংরেজী বৎসরের শেষ সপ্তাহে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিবিধ দেশহিতকর সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। এবারও কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতি, ভারতীয় সমাজ-সংস্কার সমিতি, একেশ্বরবাদীদিগের সমিতি, ভারতীয় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী প্রভৃতির অধিবেশন হইবে। সর্ব্বসম্মানিত, দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত দাদাভাই নরোজি এবার মহাসমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। এই মনোনয়নে সকলেই অত্যন্ত সুখী হইবেন। রাজনীতি বিষয়ে দাদাভাই বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ সমাজ-সংস্কার সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত বেঙ্কটরত্নম নাইডু এম. এ, একেশ্বরবাদীদিগের সমিতির সভাপতি হইবেন। ঢাকায় এই সপ্তাহেই মুশলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশন হইবে, ভারতবর্ষের মুশলমান সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান সর্ব্বপ্রধান নেতা বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত আগা খাঁ তাহার সভাপতি হইবেন।

---

**ভারত-মহিলা পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন**—আগামী জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে কলিকাতায় ভারত-মহিলা পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন হইবে। সেই সভায় শিক্ষা, গৃহধর্ম্ম, সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার অবতারণা হইবে। ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের নারীগণকে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এই সম্মিলনীতে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করা হইয়াছে।

পরিষদের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ সকলের মত দেশব্যাপী প্রচারের জন্য ইংরাজীতে এবং দেশের অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইবে।

যথাসময়ে সংবাদ পাইলে মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা সমাগত মহিলাগণের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিবার ভার গ্রহণ করিবেন। ১৫ই পৌষ ২৮শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত বেথুন কলেজ গৃহে এই

বলিয়াছেন ঃ—"নারীকে ভালবাস এবং সম্মান কর; তাঁহাদের নিকট কেবল আরাম চাহিও না; তাঁহারা শক্তি ও উদ্দীপনার উৎস স্বরূপ। * * * স্ত্রীপুরুষ এক বীণার দুটি তন্ত্রী, একটি ব্যতীত অপরটি অর্থহীন।" তিনি বিবাহ ব্যাপারকে অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। ক্রমশঃ আমরা দেখিব, তাঁহার হৃদয় কতটা প্রেমিক ও প্রেমপিপাসু ছিল। কিন্তু তাহাতে চপলতা ছিল না। একদিকে যেমন তাঁহার হৃদয় প্রদীপ্ত প্রেম ও গভীর সহানুভূতির আলয় ছিল, অপর দিকে তাঁহার অন্তরে সুদৃঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান-সঞ্জাত সংযম ও শুদ্ধতারও অন্ত ছিল না। তিনি সহজে "প্রেমে পড়ার" পাত্র ছিলেন না, কিন্তু মহিলাদিগের মধ্যে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরও অভাব ছিল না।

ম্যাটসিনির প্রেম কি সুন্দর, কতটা পূর্ণায়তন ও গভীর এবং কত পবিত্র, তাহা বুঝিতে হইলে উহাকে দুই অংশে ভাগ করিয়া দেখিতে হয়। একদিকে তাঁহার মাতা এবং ম্যাডাম রাফিনির প্রতি শ্রদ্ধা, অপর দিকে জিয়োভানী সিডোনী ও অপর একটী বালিকার প্রতি ভালবাসা। মাতার কর্ত্তব্যজ্ঞানময়, সহিষ্ণু, অপেক্ষাকারী, সন্তান-গৌরবোদ্ভাসিত প্রেম, এবং ম্যাডাম রাফিনির বিশ্বাসপূর্ণ, স্নেহবিহ্বল, সুকোমল, মঙ্গলকারী বাৎসল্য ম্যাটসিনির জীবনের উপর, হৃদয় ও মনের উপর, চিরদিন অমৃতময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

জিয়োভানী সিডোনীর সহিত যখন ম্যাটসিনির প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বিধবা। তাঁহার স্বামী স্বদেশের জন্য নিগৃহীত ও স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে সিডোনীকে আত্মব্রতে দীক্ষিত করিয়া যান। সিডোনী বাল্যকাল হইতেই স্বদেশ-প্রেমে পূর্ণ ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিভা অনুসারে আরও গভীর ভাবে দেশের কাজে মনোনিবেশ করিলেন। এই সূত্রে ম্যাটসিনির সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। তাঁহাদের উভয়ের স্বদেশ-প্রীতি, জীবনব্রতের একতা এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমশঃ প্রেমে পরিণত হইল। ম্যাট্‌সিনি সিডোনীকে বাক্ দান করিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই ম্যাট্‌সিনি তাঁহার ভাবী পত্নীকে তাঁহার দূত স্বরূপে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ফ্লোরেন্সে পাঠাইলেন। সে সময় একজন নারীর পক্ষে এইরূপে বিদেশ গমন অত্যন্ত বিপদজনক ছিল, প্রতিমুহূর্ত্তে কারারুদ্ধ হওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু ম্যাট্‌সিনির ও সিডোনীর প্রেম এমনই সবল ও নির্ভীক ছিল, যে তাঁহারা কেহই এই ব্যাপারে বিচলিত হইলেন না। এই সময় তাঁহাদের মধ্যে যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা রাজকর্ম্মচারীগণ খুলিয়া পড়িয়া নকল করিয়া লইয়া তবে পাঠাইয়া দিতেন। সেই পত্রাবলীর একখানিতে ম্যাট্‌সিনি লিখিয়াছেন, "তোমার পত্রের অনেক শব্দ এখনও আমার হৃদয়ে আনন্দের কম্পন আনয়ন করে। * * * আমি তোমার কেশগুচ্ছ চুম্বনে আচ্ছাদিত করিয়াছি।" অপর এক জন বন্ধুকে আর একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, "তিনি যতটা ভাবেন, আমি তাঁকে তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি। দিন রাত্রি আমার মন তাঁর চিন্তায় পূর্ণ থাকে।" এক ভাবের ভাবুক, এক পথের পথিক, দুইটি পবিত্র মহৎ হৃদয়ের এই সুগভীর সতেজ প্রদীপ্ত ও ব্যাকুল প্রেম কি সুন্দর! এই প্রেম চিরদিন স্থির ছিল। কিন্তু ম্যাট্‌সিনির অবসরহীন কর্ম্মব্যস্ত গৃহহীন জীবন বিবাহের অন্তরায় হইয়া তাঁহাদের মধ্যে যে সুদীর্ঘ ছাড়াছাড়ি আনয়ন করিয়াছিল, তাহা শেষ জীবনে তাঁহাদের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল।

আর একটী নারী,—একটী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। যখন ম্যাট্‌সিনি গোপনে নানা স্থানে বাস করিতেন, সেই সময় কোন পরিবারে অবস্থান কালে এই কুমারীর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। এই কোমলহৃদয়া নারী প্রথমে করুণাবশতঃ গৃহহীন ম্যাটসিনির প্রতি আকৃষ্ট হন, তৎপরে তাঁহার শিষ্যার স্থান অধিকার করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা আকৃষ্ট হন। অবশেষে ম্যাট্‌সিনির হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া প্রমত্ত প্রেমে আত্মহারা হইয়া পড়েন। কিন্তু ম্যাট্‌সিনির মনে ভাই বোনের মত একটা প্রীতির ভাব জন্মিয়াছিল মাত্র। যখন ম্যাট্‌সিনি লণ্ডনে চলিয়া

গেলেন, তখন তাঁহার বিরহে এই বালিকা ক্রমশঃই নিদাঘে পুষ্পের ন্যায় ম্রিয়মাণ হইতে লাগিলেন। বন্ধুগণ যখন প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলেন, তখন তাঁহারা ম্যাট্‌সিনিকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া একবার আসিয়া দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের পত্র পাঠ করিয়া ম্যাট্‌সিনির হৃদয় ক্রন্দন করিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি যে সিডোনীকে বাক্য দান করিয়াছেন! তিনি বুঝিলেন, এ অবস্থায় তাঁহার সাক্ষাৎ সুফল প্রসব করিবে না। মন একবার তাঁহার কাছে যাইবার জন্য এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য ব্যাকুল হইল, তবুও যাইতে পারিলেন না। তিনি বন্ধুদিগকে লিখিলেন, "তোমরা তাঁহার নিকট কেবল আমার দোষের উল্লেখ করিয়া আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ কমাইতে চেষ্টা কর।" কত কষ্টে, নিতান্ত বাধ্য হইয়া তিনি উক্ত পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ও সেই বালিকার প্রতি কত আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে বুঝিতে পারা যায়। "আমি যে সহজে এমন পবিত্র প্রফুল্লহৃদয় পুষ্পটিকে আমার ভাব, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও প্রেমের সিঞ্চনে রক্ষা করিতে চাহিতেছি না, তাহা নহে।"

সেই কোমল-হৃদয়া বালিকা, ম্যাট্‌সিনির প্রতি উত্থিত প্রেম-হোমানল-শিখা আত্মীয় বন্ধুগণের শত চেষ্টাতেও প্রশমিত করিতে পারিলেন না; অচিরে তাহাতে আত্মাহুতি দিয়া অমৃতধামে চলিয়া গেলেন। ধর্ম্মপ্রাণ, বিশ্বাসী, পরম প্রেমিক ম্যাট্‌সিনি আকুল হৃদয়ে পরলোকের পানে চাহিয়া বিশ্বাস করিলেন, সেখানে একদিন মিলন হইবে। অতৃপ্ত প্রেমের দহনে ম্যাট্‌-সিনির জীবন জর্জ্জরিত ছিল। তিনি এই ঘটনার বহু দিন পরে কোনও বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "ঘটনা-চক্রে যাহার ভাগ্যে প্রেমের আবেষ্টনময় স্নিগ্ধ পারিবারিক জীবন সম্ভব হয় না, তাহার হৃদয়ের শূন্যতা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। এ বিষয়ে আমি একজন ভুক্তভোগী।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

---

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

**ইংরেজী বর্ষের শেষ সপ্তাহ**—এখন প্রতি বৎসরই ইংরেজী বৎসরের শেষ সপ্তাহে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিবিধ দেশহিতকর সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। এবারও কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতি, ভারতীয় সমাজ-সংস্কার সমিতি, একেশ্বরবাদীদিগের সমিতি, ভারতীয় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী প্রভৃতির অধিবেশন হইবে। সর্ব্বসম্মানিত, দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত দাদাভাই নরৌজি এবার মহাসমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। এই মনোনয়নে সকলেই অত্যন্ত সুখী হইবেন। রাজনীতি বিষয়ে দাদাভাই বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ সমাজ-সংস্কার সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত বেঙ্কটরত্নম নাইডু এম, এ, একেশ্বরবাদীদিগের সমিতির সভাপতি হইবেন। ঢাকায় এই সপ্তাহেই মুশলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশন হইবে, ভারতবর্ষের মুশলমান সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান সর্ব্বপ্রধান নেতা বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত আগা খাঁ তাহার সভাপতি হইবেন।

---

**ভারত-মহিলা পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন**—আগামী জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে কলিকাতায় ভারত-মহিলা পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন হইবে। সেই সভায় শিক্ষা, গৃহধর্ম্ম, সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার অবতারণা হইবে। ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের নারীগণকে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এই সম্মিলনীতে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করা হইয়াছে।

পরিষদের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ সকলের মত দেশব্যাপী প্রচারের জন্য ইংরাজীতে এবং দেশের অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইবে।

যথাসময়ে সংবাদ পাইলে মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা সমাগত মহিলাগণের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিবার ভার গ্রহণ করিবেন। ১৫ই পৌষ ২৮শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত বেথুন কলেজ গৃহে এই

সভার অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনের পর অপরাহ্ণে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সান্ধ্য সম্মিলনী হইবে, কুচবিহারের মহারাণী অভ্যর্থনা কমিটির সভানেত্রী এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। বোম্বাইয়ের মিসেস রাণাডে ভারত-মহিলা পরিষদের স্থায়ী সাধারণ সম্পাদিকা। আমরা আশা করি বঙ্গের নানা স্থান হইতে মহিলাগণ পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত ভগিনীগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয়াদি দ্বারা এবং এদেশের নারীজাতির কল্যাণকর বিষয় সমূহের আলোচনাদি করিয়া সুখী ও উপকৃত হইবেন। এ বৎসর নিম্নলিখিত বিষয়ে পরিষদে প্রবন্ধ পঠিত হইবে।

গৃহ সম্বন্ধীয়।

১। গৃহের শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য। ২। আদর্শ গৃহস্থ। ৩। দাম্পত্য সম্বন্ধের আদর্শ। ৪। সন্তানের জন্ম হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত শিক্ষা ও পালন রীতি। ৫। মাসিক ১০০৲ টাকা আয়ে ৪টী সন্তান লইয়া মাসিক ৫৲ টাকা সঞ্চয় করিয়া কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। ৬। নবপরিণীতা বধূর প্রতি শ্বশ্রূর কর্ত্তব্য। ৭। সূতিকাগৃহ কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয় এবং তাহার স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা কিরূপে রক্ষা করিতে হয়। ৮। পুত্র কন্যার বিবাহের যৌতুক ও ব্যয়।

সামাজিক।

১। সমাজের ও প্রতিবেশীর প্রতি রমণীর কর্ত্তব্য। ২। গৃহস্থের সমাজ সম্বন্ধীয় সর্ব্বোচ্চ আদর্শ কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৩। সৌজন্য, সামাজিকতা ও শিষ্টাচারের আদর্শ। ৪। নারীর অবরোধপ্রথা সম্বন্ধে মতামত। ৫। নারীগণের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না।

শিক্ষা।

১। নারীর কিরূপ শিক্ষা আবশ্যক।

---

**ভারতীয় কৃষি ও শিল্প সমিতির মহিলা-বিভাগ**—আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে জাতীয় মহাসমিতির সংশ্রবে কলিকাতায় যে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে প্রদর্শন করিবার জন্য মহিলা-বিভাগে নিম্নলিখিত মহিলা-শিল্প সংগ্রহ করা হইতেছে ঃ—

সর্ব্বপ্রকার সূচীকর্ম্ম, কাঁথা, সুজনী, কাপড়ের উপরে বুটা ও পাড় তোলা হইতে সলমা চুমকীর কাজ পর্য্যন্ত, লেস, চিকেন তৈয়ারী, পুঁথির কাজ, খয়েরের গহনা, পাথর, মাটী বা কাঠের ছাঁচকাটা, পিঁড়ী চিত্র, শিকা ও চুলের দড়ি বিনান, ডালা তৈয়ারী, ফটকিরির কাজ, বুননের কাজ, বস্ত্র বয়ন, চরকার সূক্ষ্ম সূতাকাটা, সুপারি ও নারিকেলের ফুলকাটা, চিত্র-কর্ম্ম প্রভৃতি।

যাঁহারা প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে আগামী ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে হইবে। শ্রীযুক্তা কমলা বসু এই কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর মহিলা-বিভাগের অন্যতর সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার ঠিকানা, ৮৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যাঁহারা প্রদর্শনীতে দ্রব্য প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি প্রদর্শনীর অন্তে তাঁহাদিগকে ফিরিয়া পাঠান হইবে। যদি কেহ প্রদর্শনীতে তাঁহাদিগের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তবে দ্রব্যের মধ্যে তাহার মূল্য জ্ঞাপক পত্র যুক্ত করিয়া দিতে হইবে। প্রেরকদিগকে দ্রব্য প্রেরণের যাতায়াতের ভার বহন করিতে হইবে, কিন্তু প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্য কোন ব্যয় লাগিবে না। প্রদর্শিত দ্রব্যের উৎকৃষ্টতা অনুসারে পারিতোষিক বিতরিত হইবে।

---



২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।